উপমহাদেশ ও বিশ্বজাদী ঈমানের বিজয়ের লিক আহ্বানকারী

# নাওয়ায়ে গজওয়াতুল হিন্দ

রজব-রামাদান ১৪৪২ হিজরি
ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল ২০২১ ইংরেজি

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক: শহীদ হাফেজ তাম্মিব নেওয়াজ রহিমাহুল্লাহ

## ঢাকা থেকে দিল্লী, শ্রীনগর থেকে ইসলামাদ পর্যন্ত সকল ঈমানদারদের ঘোষণাঃ

"لِغَـــيرِ اللـــه لَـــن نركـــع!"

"আমরা আল্লাহ ব্যতিত কারো সামনে কিছুতেই মাথা নত করবো না!"

# নাওয়ায়ে গজওয়াতুল হিন্দ

উপমহাদেশ ও বিশ্বব্যাপী দ্বীনের বিজয়ের দিকে আহ্বানকারী

রজব-রামাদান ১৪৪২ হিজরি / ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল ২০২১

জিলদ:১৪, সংখ্যা:২

অনুবাদ ও প্রকাশনা

AL HIKMAH MEDIA

# সূচীপত্র


জিহাদ কবুলের শর্তসমূহ (চতুর্থ কিস্তি) ..... ২
মুসলিম বোনদের প্রতি মহাব্বতপূর্ণ কিছু কথা ..... ২
উস্তাদ আহমাদ ফারুক রহিমাহুল্লাহ এর সোহবতে (কিস্তি-২১) ..... ২
গণতন্ত্র একটি নতুন ধর্ম (দ্বিতীয় কিস্তি) ..... ২
কিছু চিন্তা, কিছু মতামত ..... ২
তাওহীদের সফর ..... ২
কাশ্মীরের জিহাদে আমার অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণ ..... ২
হিন্দু: নিকৃষ্ট শাসক ও উৎকৃষ্ট জনগণ ..... ২
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ○ ..... ২

# জিহাদ কবুলের শর্তসমূহ (চতুর্থ কিস্তি)

শহীদ আলেমে রব্বানী উস্তাদ আহমদ ফারুক রহিমাহুল্লাহ

জিহাদের প্রথম শর্ত হল ইখলাসের সাথে জিহাদ করা। দ্বিতীয় শর্ত হল আমীরের ইতাআত বা আনুগত্য করা। তিন নাম্বার শর্ত হল নিজের সর্বোত্তম মাল আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা। চার নাম্বার শর্ত হল নিজের সাথীদের জন্য প্রশান্তির কারণ হওয়া। পাঁচ নাম্বার শর্ত হল জমিনে সৃষ্ট ফেতনা-ফাসাদ থেকে বেঁচে থাকা।

হাদিস শরীফে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি এই পাঁচ শর্ত পূরণ করবে তার শোয়া-জাগ্রত থাকা সব ছওয়াবের কাজ হিসেবে গণ্য হবে।

এর থেকে আর বড় ফজিলত কি হতে পারে যে, আমাদের মত লোক যারা এমনিতেই বেশি ঘুমায় তাদের ঘুম, তাদের জাগ্রত হওয়া সব ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে শুধু মাত্র পাঁচ শর্ত পূরণ করার কারণে।

তো ইনশাআল্লাহ যারা এই পাঁচটি শর্ত পূরণ করবে, এবং কোন ফাসাদ সৃষ্টির মাধ্যম হবে না, তাদের অস্তিত্ব রহমতের কারণ হবে। মুজাহিদদের কাতারে তার উপস্থিতি মোহাব্বতের কারণ হবে। তার অস্তিত্ব মুজাহিদদের পারস্পরিক সু-সম্পর্ক তৈরি করা ও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরি করার মাধ্যম হবে। এমন বরকতময় ব্যক্তির উপস্থিতি পুরো জিহাদের জন্য কল্যাণের কারণ হবে। তার ব্যাপারেই হাদিসে বলা হয়েছে যে, তার ঘুম তার জাগ্রত থাকা সব ইবাদত।

অপর দিকে আরেক হাদিসে আছে, যে ব্যক্তি যুদ্ধ করল হাদিসে জিহাদ শব্দ না, গাজা (غزا) শব্দ ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তবে যদি সে যুদ্ধও করল গৌরব অর্জনের জন্য, লোক দেখানোর জন্য, মানুষের মাঝে নিজের নাম চর্চার জন্য, তাহলে তো সে প্রথম শর্ত নষ্ট করে দিলো। সে ইখলাসের পরিবর্তে এই সব বিষয়কে উদ্দেশ্য নিয়েছে। সে চিন্তা করেছে যে, আমি গর্বের জন্য যুদ্ধ করব। জাতীয়তা ও স্বজনপ্রীতির জন্য যুদ্ধ করব। নিজের দল, গোত্র, বংশকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য যুদ্ধ করব । এই চিন্তায় যদি যুদ্ধ করে তাহলে সে নিজেকে ধ্বংস করল। অথবা যদি সে এই নিয়তে জিহাদ করে যে, আমার বাহাদুরি সবার সামনে প্রকাশ পেয়ে যাক, সবাই আমার নাম উচ্চারণ করুক। যদি শেষ গুলি আসার সময়ও তার মনে এই কথা আসে যে আমার সাথীরা আমাকে দেখছে, আমার

বাহাদুরি দেখছে, তারা গিয়ে আমার প্রশংসা করবে। তাহলে তার পিছনের সব কিছু সে বরবাদ করে দিল।

এজন্য সর্বদা নিজের নিয়তকে ঠিক রাখা। আল্লাহকে ভয় করে কাজে নামা। মুখে এমন কথা না বলা, এমন চিন্তা না আনা যা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে।

অনেকে মনে করে জিহাদে এসেছে তো সব পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। পরীক্ষা তো কেবল শুরু। পরীক্ষা এখনও অনেক বাকি আছে। তার মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন হল নিয়তকে ঠিক করতে থাকা। নবায়ন করতে থাকা। নিয়তকে হেফাজত করতে থাকা। বিশেষ করে যখন কোন সমষ্টিগত আমল হয়। জিহাদ এমন একটি আমল। জিহাদ হলে অন্যরা তাকিয়ে থাকে। জিহাদে নিয়ত আল্লাহর জন্য রাখা একটি বড় কাজ।

জিম্মাদারদের নিয়ত সর্বদা আল্লাহর জন্য রাখা। যখন কোন ব্যক্তি কোন জিম্মাদারিতে আসে। তখন তাকে মানুষ সম্মানের চোখে দেখে। তার দিকে ইশারা করে। তার নাম মানুষের মুখে মুখে চর্চা হয় । এটা অনেক বড় এক ফেতনা। সে দুয়া করতে থাকবে যে, আল্লাহ যেন নিরাপদে তাকে এই জিম্মাদারি থেকে বের করে আনেন। কারণ আল্লাহর রহমত না হলে এই পরীক্ষা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়।

তেমনিভাবে যদি তার গর্ব অথবা লোক দেখানো অথবা প্রসিদ্ধির নিয়ত থাকে তাহলে তার জিহাদ বাতিল হয়ে যাবে। সাথে আরও একটি বিষয় হল, যদি কেউ আমীরের নাফরমানি করে, তার ইবাদতও আল্লাহর কাছে কবুল হবে না। তৃতীয় কথা হল, কেউ যদি জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করে, হোক সে সাথীদেরকে সংকীর্ণ করে ফাসাদ করে। অথবা সাথিদের গীবত করে অথবা সাথীদের মাঝে অনৈক্য সৃষ্টি করে। যেভাবেই ফাসাদ সৃষ্টি করুক না কেন। সাথীদের মাঝে মোহাব্বত সৃষ্টি করে না। লোকদেরকে আপন করে নেয় না। ফাটল সৃষ্টি করে কিন্তু ঐক্য গড়ে তোলে না। যার মধ্যে এই বিষয়গুলো থাকবে, অর্থাৎ নিয়তও ঠিক নেই, আমীরের আনুগত্যও করে না। আবার ফাসাদও সৃষ্টি করে। ভালো কাজের মাধ্যম হয় না। মুজাহিদদেরকে কমজোর করে। মুজাহিদদের সাহস কমিয়ে দেয়। পারস্পারিক ঝগড়া সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে হাদিস অনেক কঠিন কথা বলে। শুধু এতটুকু না যে, সে খালি হাতে ফিরে যাবে। বরং যে পরিমাণ নেকি নিয়ে সে জিহাদের ময়দানে

এসেছে, তাও শেষ হয়ে যাবে। সে নিজের ক্ষতি করে ফেলবে। অর্থাৎ যদি সে দশ হাজার নেকি নিয়ে ময়দানে আসে। আর এই দোষগুলো তার মাঝে পাওয়া যায় তাহলে তার এই দশ হাজার নেকিও শেষ হয়ে যাবে। আর গুনাহ নিয়ে সে ময়দান থেকে ফিরে যাবে। দুইজন মানুষ এক মারকাযে থাকে একসাথে নামাজ ইবাদত জিহাদ করে। তারপরেও একজন আল্লাহর রহমতের ছায়াতলে থাকে, ছওয়াব অর্জন করে। আরেকজন কিছুই অর্জন করে না। বরং সে আরও গুনাহ নিয়ে ফিরে যায়। নিজেও কুলক্ষণে পরিণত হয় আর মুজাহিদদের জন্যও বিপদের কারণ হয়ে দাড়ায়।

### আমার প্রিয় ভাইয়েরা!

যে ব্যক্তি এই হাদিস নিয়ে একবারও চিন্তা করবে সে কেঁপে উঠবে, আল্লাহ! আমি কি পাঁচটি শর্ত পূরণ করছি? জীবনে কত দিন জিহাদের ময়দানে পার করছি। একদিনও কি আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে? দুনিয়াতে এর কোন উত্তর নেই আখেরাতে এর উত্তর পাওয়া যাবে।

নিজের কাজের ব্যাপারে দুনিয়াতে কিছুই বলা যায় না। আমি যে এখন কথা বলছি তা কোন নিয়তে বলছি  তা আমি বলতে পারব না আল্লাহ কিন্তু জানেন যে, আমি কোন নিয়তে কথা বলছি। আল্লাহ আমাদের নিয়তকে খালেস করে দেন। কিন্তু শয়তান এমন ভয়ানক যে, সে মানুষের শরীরের রগে রগে চলে। তার আর কাজ বা কি? সে মানুষকে নিকৃষ্ট খারাপ কাজকে সব কিছু থেকে বেশি সুন্দর করে দেখায়।

তো আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন যে, আমাদের উঠা বসা কার জন্য। আমাদের ঘুম জাগ্রত হওয়া কার জন্য। আমাদের এই কষ্ট সহ্য করা, শীতে কষ্ট করা, ঠাণ্ডার মধ্যে ক্যাম্পে অবস্থান করা কার জন্য?

সবার বুঝা উচিৎ যে, আমি সবাইকে ধোঁকা দিতে পারি। সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পারি। সবাইকে খুশি করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারি। আমার নামের সাথে শহীদ শব্দ প্রয়োগ হতে পারে। আমার ব্যাপারে মানুষ ভালো ধারণা করতে পারে। কিন্তু বিষয়টি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহ ছাড়া এই সমস্ত বিষয়ে আর কেউ কোন উপকার করতে পারবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا

“অর্থ: কেয়ামতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে একাকী অবস্থায় আসবে”। [সুরা মারিয়াম - ১৯:৯৫]

কেয়ামতের দিন সবার একাই আসতে হবে। তো আমার ব্যাপার আল্লাহর সাথে ঠিক করে নিতে হবে। আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ ছাড়া কেউ বাঁচাতে পারবে না। আল্লাহ ছাড়া কেউ সাহায্য করবে না।

তো ভাইয়েরা যখন বিষয়টি এমনই কঠিন। এত শক্ত। এজন্য আল্লাহ তা’আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ

“অর্থ: হে ঈমানদার-গণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিৎ ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক। এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না”। [সুরা আল-ইমরান - ৩:১০২]

অতএব, হে মুমিনগণ আল্লাহকে ভয় কর। আর মুসলিম না হয়ে মৃত্যু বরণ কর না। শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত নিয়ত ঠিক রাখা, তাওহীদের উপর মজবুত থাকা ও ঈমান ঠিক রাখা এটি অনেক বড় পরীক্ষা।

এত বড় পরীক্ষা যে, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে, আখেরাতের কঠিন অবস্থা যা আল্লাহ আমাকে জানিয়েছেন, তার কিছু যদি তোমরা বুঝতে , তোমরা তো মেরাজে গমন করনি। সেখানের কোন কিছু দৃষ্টিগোচর হয়নি। যদি তোমরা দেখতে আমি যা দেখেছি তাহলে খুব কমই হাসতে ও অনেক বেশি কাঁদতে। কারণ এত কঠিন পরিস্থিতি সামনে আছে। এটা হাঁসি-রসিকতার বিষয় নয়। চিন্তার বিষয়, হয়তো চির সৌভাগ্য অথবা চির দুর্ভাগ্য। সে তো চরম মূর্খ, যে এই বিষয়কে হাসি তামাশা মনে করে। যে ব্যক্তি এটি তথা জিহাদকে গুরুত্ব সহকারে না নেয়, যে ব্যক্তি এই পাঁচ শর্তকে পুরা করার চেষ্টা না করে। তো এত পরীক্ষা সামনে আছে যে, আল্লাহই জানেন যে, আমাদের কার শেষ পরিণতি কেমন হবে।

হাদিসের কিতাবে আছে - সাহাবীদের অবস্থা, তাবীঈদের অবস্থা, পরবর্তী সালাফগণের অবস্থা এমন ছিল যে, তারা সর্বদা সবচেয়ে বেশি শেষ পরিণতির কথা চিন্তা করতেন। কারণ হাদিসের ভাষ্যমতে শয়তানের সবচেয়ে বড় হামলা এই সময়ে হয় যখন মানুষের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে। ইবনুল জাওযী রহ. লিখেছেন শয়তান মানুষের মৃত্যুর সময় তার চেলাদের বলে আজকে যে করেই হোক তাকে কব্জা করতে হবে। আজকে যদি সে তোমাদের হাত ছাড়া হয়ে যায় তাহলে আর কখনও তোমাদের কব্জায় আসবে না।

যখন মানুষ মৃত্যুর সব কিছু দেখতে পায় তখন শয়তান তাকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে। এটা সাধারণ কোন বিষয় নয়। যখন মানুষ মৃত্যু দেখে তখন শয়তান বিভিন্নভাবে সন্দেহ সৃষ্টি করে। জিহাদে আসা কি ঠিক ছিল? এতো জরুরী ছিল? আল্লাহ তা'আলা-ই জানেন কি কি চিন্তা মনের মধ্যে শয়তান সৃষ্টি করে।

এই সময় আল্লাহ ছাড়া আর কে বাঁচাবে? আল্লাহই পারেন বাঁচাতে। হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও দুয়া করেছেন আমাদেরকেও শিখিয়েছেন হে আল্লাহ আমাদের শেষ পরিণতি ভালো করেন। আমার শেষ আমল সবচেয়ে সুন্দর বানিয়ে দিন। যে দিন আমাকে নিয়ে যাবেন সে দিনকে আমার শ্রেষ্ঠ দিন বানিয়ে দিন। আমাদের সবার এই দুয়া করা উচিৎ কেননা মানুষ যেই অবস্থায় থাকবে তার পরিণতিও তার উপর হবে।

**(চলবে, ইনশা আল্লাহ...)**

# মুসলিম বোনদের প্রতি মহাব্বতপূর্ণ কিছু কথা

প্রবন্ধটি পশতু ভাষায় লিখেছেন: **আহমাদুল্লাহ ওয়াসিক**, উর্দু অনুবাদ: **জালালুদ্দীন হাসান ইউসুফজাঈ**

বর্তমান এই ফেতনার যুগে ইসলামের দুশমন নাস্তিক-সেকুলারপন্থীরা মুসলিমদেরকে এই দ্বীন থেকে বিচ্যুত করে গোমরাহির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। বিশেষভাবে মুসলমান মা-বোনদেরকে গোমরাহি ও বিচ্যুতির দিকে ঠেলে দেয়ার জন্য বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে এবং অগণিত চিত্তাকর্ষক শিরোনামের পোশাক পরিয়ে নানারকম ফন্দি আঁটছে, যাতে করে আমাদের মুসলমান মা-বোনদেরকে অশ্লীল-বেহায়াপনার প্রতি আসক্ত করা যায়। আলোচ্য বিষয়ে আমরা আমাদের মুসলিম বোনদেরকে ঐ সকল অন্যায়-খারাপ কাজ থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যার মধ্যে তারা লিপ্ত হতে পারে। প্রত্যেক মুসলিম বোনদের উচিত ইসলামের দুশমনদের এই সকল কুটচাল-ষড়যন্ত্র বুঝে তা থেকে নিজেকে বাঁচানো এবং নিজ দুর্গে দৃঢ়তা এবং সাবধানতার সাথে পাহারাদারি করা।

হে আমার মুসলিম বোন! ইসলাম তোমাদের আহবান করছে; মনোযোগ দিয়ে শোনো; ইসলাম তোমাদের কী বলছে,

হে আমার মুসলিম বোন! আমাদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা তোমাদেরকে কেন্দ্র করেই। তোমরা আমাদের সন্তানদের তরবিয়ত-প্রতিপালন করবে ইসলামী শরীয়ার ছায়াতলে। কিন্তু উত্তরোত্তর অবস্থার পরিবর্তন, পশ্চিমা সংস্কৃতির অসভ্য ঢেউ বোনদের আঁচল প্রবাহিত করে নিয়েছে এবং ইসলামী সভ্যতার উঁচু মিনারাগুলোকে ধ্বংস করে শরয়ী হিজাবের ইজ্জত-আব্রুকে পদদলিত করেছে।

হে আমার মুসলিম বোন! তুমি কি জানো, পশ্চিমারা তোমার জন্য কলঙ্ক। তোমাকে বাজারে বের করে আনার বাহানা দিয়ে তোমার মাথা থেকে হিজাব সরিয়ে দিয়েছে এবং তোমাকে গোমরাহির গর্তে ফেলে দেয়ার জন্য প্রতি বছর নিত্য-নতুন কলা-কৌশল, পরিকল্পনা এবং প্রোগ্রাম সাজাচ্ছে। নারী অধিকার এবং এ জাতীয় অন্যান্য অধিকারের ঢোল পেটানোর উদ্দেশ্য হলো-ইসলামী শরীয়া প্রদত্ত সম্মান-মর্যাদা ছিনিয়ে নেয়া। এই কাফেররা তোমার ইজ্জত-আব্রু ছিনিয়ে নিতে চায়। তারা চায়, তোমার থেকে তোমার ঐ সকল অধিকার এবং পাওনা ছিনিয়ে নিতে, যার মাধ্যমে ইসলাম তোমাকে মহা-সম্মানে ভূষিত করেছে।

তুমি কি জানো ইসলাম তোমাকে কত ইজ্জত-সম্মান দিয়েছে? ইসলাম তো তোমাকে বোনের মর্যাদা দিয়েছে। যে বোনের ইজ্জত-আব্রুর হেফাজতের জন্য যুগে-যুগে মুসলমানগণ নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন এবং নিজের রক্তের বিনিময়ে তোমার ইজ্জতের হেফাজত করেছেন।

হ্যাঁ! ইসলাম তো তোমাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছে গৃহের দায়িত্ব পালনের জন্য তোমাকে নির্বাচন করে অসংখ্য অধিকার দিয়েছে। এই সকল অধিকার দেয়ার পাশাপাশি ইসলাম তোমাকে এমন ইজ্জত-সম্মান দিয়েছে যা অন্য কারো ভাগ্যে ঝুঁটেনি। আর তা হচ্ছে-তোমাকে মাতৃত্বের আসনে সমাসীন করে জান্নাতকে তোমার পদতলে সাব্যস্ত করেছে।

তাই হে আমার বোন! ইসলাম তোমাকে যে ইজ্জত-সম্মান দিয়েছে তার হেফাজত করো। পশ্চিমারা সমতার নামে তোমার অধিকার তোমার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তোমাকে টাকা-পয়সা উপার্জনের মাধ্যম বানাতে চায়। তুমি টেলিভিশন, সংবাদপত্র, বিজ্ঞাপন-বোর্ড এবং ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্য-সামগ্রীর উপর নির্লজ্জ নারীদের ছবি হয়ত দেখে থাকবে। তুমি বলো, এটাই কি নারীর অধিকার? নারী কি এতই সস্তা এবং মূল্যহীন যে, মানুষ তার সাথে বাজারি পণ্যের মত ব্যবহার করবে?

হে আমার বোন! পশ্চিমারা তোমাকে এই কৃষ্টি-কালচারের দিকেই আহবান করছে। তারা তোমাকে ঐ নামসর্বস্ব অধিকার দিতে চায়, যার মাঝে রয়েছে ইহকাল এবং পরকালের অপমান। যে ঘরে তুমি রাণী, যে ঘরে তোমার স্বামী তোমাকে এমন ইজ্জত-সম্মান করে যেমন হাদিসে এসেছে- ভদ্র পুরুষ মহিলাদের মেনে নেয় এবং তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে (শরীয়তের সাথে অসাংঘর্ষিক বিষয়ে) এবং অভদ্র পুরুষ মহিলাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। পশ্চিমারা তোমাকে ঐ ঘর থেকে বের করে যার মাঝে তুমি রাণী। গোটা সমাজের দাসী বানাতে চায়। তারা তো তোমাকে বাজারি পণ্য বানিয়ে তোমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত প্রতিটি অঙ্গের মূল্য এভাবে নির্ধারণ করতে চায় যেভাবে একজন কসাই তার দোকানে গোস্তের প্রতিটি টুকরার মূল্য নির্ধারণ করে থাকে।

ইসলাম তো তোমাকে এই শিক্ষা দেয় যে, প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হবে না। যদি বের হতেই হয়, তবে বের হবার সময় দৃষ্টি অবশ্যই নিম্নগামী করবে এবং নিজের ইজ্জত ও আব্রুর হেফাজত করবে।

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

"আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক জাহেলী যুগের মত সৌন্দর্য অবলম্বন করো না।" (সূরা আহযাব: ৩৩ - ৩৩)

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

অর্থ: হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রী, কন্যা এবং ও মুমিনা নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর ঝুলিয়ে দেয়, তাদেরকে চেনার ব্যাপারে এটাই সবচেয়ে কাছাকাছি পন্থা হবে। ফলে তাদেরকে কষ্ট দেয়া হবে না। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। সূরা আহযাব ৩৩: ৫৯

হে আমার মুসলিম বোন! ইসলাম তোমাকে শিক্ষা দেয়- কারো সাথে অবৈধ সম্পর্ক, গিবত, চোগলখোরি এবং ধোঁকা-প্রতারণা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে। খারাপ থেকে বেঁচে থাক এবং এমন মজলিশে যাবে না যেখানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা থাকে। আকৃতি এবং পোশাকের ক্ষেত্রে পুরুষের সাদৃশ্য থেকে বেঁচে থাক এবং এমন পোশাক পরিধান কর যা বেশী ছোটও না, পাতলাও না এবং আঁটসাঁটও না।

হে আমার মুসলিম বোন! ইসলাম তোমাকে বলে- স্বামীর আনুগত্য করো। তার অনুমতি ব্যতীত ঘর থেকে বের হয়ো না। আমানতের হেফাজত করো এবং তার গোপন কথা অন্যের সামনে প্রকাশ করো না। যদি তুমি স্বামীর অকৃতজ্ঞতা থেকে বাঁচতে পার, তাহলে ইসলাম তোমাকে জান্নাতে যাওয়ার সুসংবাদ দিচ্ছে।

পশ্চিমারা তোমার অধিকার পদদলিত করে এই শ্লোগান দিচ্ছে যে, নারী-পুরুষের সমান অধিকার। এসব শ্লোগানের মাধ্যমে তারা তোমার ঐ ধর্মীয় দায়িত্ব ছিনিয়ে

নিতে চায়, যা নিয়ে তুমি গর্ব করে থাকো। আর এসব অন্যায় শ্লোগানের মাধ্যমে তোমার দুনিয়া ও আখিরাত বরবাদ করতে চায়।

হে আমার মুসলিম বোন! আমরা তো তোমার কাছে অনেক আশাবাদী যে, তুমি ইসলামী চেতনায় এমন এক বংশধারা তৈরি করবে যারা দেশ ও মাতৃভূমিকে হেফাজত করবে।

আমরা তো তোমার কাছে এই আশা করি যে, তুমি যখন গৃহে অবস্থান করবে তখন খাদিজা, আয়েশা এবং ফাতেমার মত অবস্থান করো। যখন শত্রু তোমার ঘরে আক্রমণ করবে তখন সাফিয়্যা, উম্মে আম্মারা এবং খাওলার মত হয়ে যাও। আর যখন নিজ সন্তানদেরকে ইসলামের জন্য কুরবানি দেয়ার সময় এসে যাবে, তখন আসমা ও খানসা হয়ে যাও। (তাঁদের উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হওন!)

আমার সম্মানিতা মুসলিম বোন! একজন মুসলিম ভাই হিসেবে আমি তোমার কাছে বিনীত নিবেদন করছি- আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বিনষ্ট করো না। এমন সভা-প্রোগ্রামের ধারে কাছেও যাবে না, যেখানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা রয়েছে। যেখানে কোন এক বাহানায় তোমাকে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং তোমার ধর্মীয় অধিকারকে ভূলণ্ঠিত করা হচ্ছে। আমার বোন! তুমি আমার কথাগুলো অবশ্যই মানবে, আর বোন তো তার ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করেই থাকে।

(প্রবন্ধটির পশতুভাষী লেখক আহমাদুল্লাহ ওয়াসিক ইমারাতে ইসলামী আফগানিস্তানের মিডিয়া কমিশনের নায়েবে মাসুল।)

# উস্তাদ আহমাদ ফারুক রহিমাহুল্লাহ এর সোহবতে (কিস্তি-২১)

মুইনুদ্দীন শামী

**বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম**

নিঃসন্দেহে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি আমাদের রব, তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাদেরকে মৃত্যু দান করেন। আর নিঃসন্দেহে তিনি মৃত্যু ও জীবনকে সৃষ্টি করেছেন যাতে, তিনি দেখে নিতে পারেন আমাদের মধ্যে কে উত্তম আমল (সৎকর্ম) সম্পাদন করে!

উস্তাদ ফারুক এর সোহবত: তথা উস্তাদ আহমাদ ফারুক (রহিমাহুল্লাহ) এর সাথে কয়েকটি সাক্ষাত, তার কিছু স্মৃতিচারণ আর কিছু মূল্যবান কথা। তাঁর এমন কিছু অমূল্য বাণী রয়েছে যা আমার নিকট বিশেষভাবে ভালো লাগে। হযরত উস্তাদের সাথে যতবার সাক্ষাৎ হয়েছে, যদিও সবগুলো হুবহু স্মৃতিতে নেই। তবে যেগুলো এখনও স্মৃতিপটে মুক্তার দানার ন্যায় এলোমেলোভাবে জ্বলজ্বল করছে সেগুলোকে কাগজের গায়ে অঙ্কন করার ইচ্ছা করছি। আল্লাহ চাহেন তো এগুলো আখেরাতে নাযাতের পাথেয় হবে। আমিসহ উস্তাদ (রহিমাহুল্লাহ) কে যারা একমাত্র স্রষ্টার জন্য হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন তারা প্রত্যেকেই দুনিয়া ও আখেরাতে লাভবান হব। আল্লাহ তা'আলা আমাকে বিশুদ্ধ কথা মালাকে সহীহ নিয়্যতে এবং সঠিক পদ্ধতিতে উপস্থাপকদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করে নিন। (আমিন)-

**নোট:** চলমান আলোচনায় যেখানেই 'উস্তাদ'শব্দটি আসবে সেখানেই এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'শহীদ ও আলেমে রব্বানী উস্তাদ আহমাদ ফারুক রহিমাহুল্লাহ'।

# শহীদ জাওয়াদ আরীফ [২]

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ট নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর। হে আল্লাহ ! আপনি আমাকে এমন বিষয়ের তাওফিক দান করুন যা আপনি ভালোবাসেন এবং তার

প্রতি আপনি সন্তুষ্ট। আর আপনি আমাদের প্রত্যেক কঠিন বিষয়কে সহজ করার ব্যাপারে সদয় হোন। কেননা, সকল কঠিন বিষয় আপনার কাছে অতি সহজ। আমীন

**গীবত থেকে বাঁচার অনন্য পন্থা:**

উস্তাদ রহিমাহুল্লাহ তাঁর ডান হাত ও নায়েব এবং আমার সম্মানিত শাইখকে একবার বললেন, যে "দু'জন সাথীকে সবসময় নিজের সাথে রাখবেন" তাদের মধ্যে একজন ছিলেন মুসআ'ব ভাই। শাইখ আমাকে বললেন সে দু'জন সাথীর মাঝে বিশেষ করে মুসআ'ব ভাইয়ের মাঝে একটি অনন্য গুণ ছিল, তাহলো তিনি কখনো গীবত শুনতেন না এবং করতেও দিতেন না। যদি কোন মজলিসে গীবত হতো তখনই মুসআ'ব ভাই বাধা দিতেন, আর যদি কোন কারণে বাধা দিতে সক্ষম না হতেন, তাহলে অপছন্দের ভাব প্রকাশ করে সেখান থেকে উঠে যেতেন। গীবত বা পরনিন্দা চর্চা বন্ধে এ পদ্ধতিটি অত্যন্ত কার্যকর। কয়েকবার মৌখিক বলার চেয়ে অবস্থার মাধ্যমে প্রকাশ করাটা অধিক প্রভাব ফেলে।

আল্লাহ ওয়ালাদের একটি প্রভাব এমন-ই হয়ে থাকে যে, বাহ্যিকভাবে যদিও তিনি খাটো, হালকা-পাতলা শরীর বা বাহুর অধিকারী। তারপরও তাঁর প্রভাব আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতার কারণে হয়ে থাকে। এমনিভাবে তার বয়স এবং বাহ্যিক মর্যাদা কম হলেও তাঁর প্রভাব রাজা-বাদশাহদের অন্তরেও থাকে। তাদের নাম শ্রবণে আগুনও নিভে যায়। মুসআ'ব ভাইয়ের প্রভাব তেমনি উল্লেখিত দুই দিকেই প্রবাহিত ছিল।

ঈমানদারদের উপরও তার একটি প্রতিপত্তি ছিল, তাঁর সামনে বয়সে বড় ব্যক্তি হলেও সে কিছু জায়েজ কথা বলতেও ভয় পেত। আমি এক শুভ্র চুলের অধিকারী সম্মানিত লোককে দেখেছি যিনি মুসআ'ব ভাইয়ের সামনে অত্যন্ত আদবের সাথে বসে আছেন।

**এক মুজাহিদের নম্রতা:**

মুসআ'ব ভাই প্রয়োজন ছাড়া ইংরেজি শব্দের ব্যবহার ভালো মনে করতেন না। (যেমন আমাদের দৈনন্দিন চালচলনে 'প্রয়োজন' ছাড়াই পশ্চিমাদের ফ্যাশন হিসেবে (I think, you know, actually) ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। আর এগুলোকে শাইখ আহসান আজিজ রহিমাহুল্লাহর পরিভাষায় 'উরদুশ' বলা হয়। স্বরণকালে মুজাহিদগণের মাঝে ইংরেজি পরিত্যাগের আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেছেন আহসান আজিজ রহিমাহুল্লাহ ।) একজন সম্মানিত সাথী একদিন মজলিসে একটি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেন, তখন শব্দটি উচ্চারণ করতেই ভয় পেয়ে গেলেন, এবং মুসআ'ব ভাইয়ের দিকে তাকালেন। কিন্তু মুসআ'ব ভাইয়ের নম্রতা ছিল অত্যন্ত উঁচু স্তরের। তাই তিনি না সেই সম্মানিত ব্যক্তির প্রতি তাকালেন, আর না মজলিসে অন্য কাউকে এ বিষয়টি বুঝতে দিলেন, যাতে না সেই সম্মানিত ব্যক্তি লজ্জিত হয়। এ সময়ে তাঁরা উভয়ে আরশের নিচে ঝুলন্ত ফানুস হয়ে আছেন ইনশাআল্লাহ, তারা জান্নাতের যেথায় ইচ্ছা চষে বেড়াচ্ছেন, আমরা এমনটাই ধারণা করি।

**প্রভাব দিয়ে সাহায্য:**

প্রভাব নিয়ে কথা হচ্ছিল, অন্যদিকে জালেমদের উপরও মুসআ'ব ভাইয়ের অনেক প্রভাব ছিল। এটা ভিন্ন কথা যে জালেমদের নিকট অসংখ্য শক্তির উৎস আছে, যার ফলে অধিকাংশ সময় তাদের প্রভাবান্বিত হওয়াটা প্রকাশ পায়না। কিন্তু আপনি চিন্তা করে দেখুন, বর্তমান সময়ে কোন সংরক্ষণকারী বর্ম বা প্রতিরক্ষামূলক জ্যাকেটের একটি সাধারণ কাপড়ের পোশাক, কোন ব্যারাকে নয় সাধারণ ঘরের অধিবাসীদের ঘরেও বিদ্যমান থাকে। শুধু ক্লাসিনকোভ এবং এ মানের কিছু এমুনেশনধারী আল্লাহর রাহে জিহাদ-কারীদের পিছনে যখন শুত্রুরা নিজেদের লাখ লাখ ডলার এবং উপকরণ ঢেলে দেয়, তাহলে এটা তাদের ভয় ছাড়া আর কি হতে পারে?

যখন শত্রুর ড্রোন বিমানগুলো, গোয়েন্দা, ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট এবং বিভিন্ন প্রকারের উপকরণ যা সম্পর্কে আমাদের ধারণাও নেই, তা যদি কোন এক ব্যক্তির পিছনে লেগে থাকে তাহলে এটা কি সেই ফকির মনিষীদের প্রতি ভয় নয়? যা শত্রুদের উপর প্রবল হয়ে আছে!

আমার সম্মানিত উস্তাদ মৌলভী হাফেজ তায়্যিব সাহেব (আল্লাহ তা'আলা তাকে সকল অনিষ্ট এবং ক্ষতি থেকে হেফাজত করুন) প্রায় সময় বলতেন, আল্লাহ তা'আলা মুজাহিদীনকেও এমন প্রভাবের অংশ দান করেছেন, যে প্রভাব হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করা হয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে,

نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ

অর্থাৎ আমাকে কাফেরদের উপর প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। (সহিহ বুখারী-৬৯৯৮)

মুসআ'ব ভাইয়ের বিষয়টি এমনই ছিল। আল্লাহ তা'আলা মুসআ'ব ভাই রহিমাহুল্লাহ থেকে অনেক বড় কাজ নিয়েছেন। আমেরিকান ফ্রন্ট লাইনের একক ইন্টেলিজেন্স, বরং গায়ের রং এবং ভাষা ভিন্ন থাকা সত্ত্বেও নিজের মাঝে সুপ্ত বিশ্বাস এবং বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির বিবেচনায় ছিলেন একজন আমেরিকান। (সে সব দেশের লোকদের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের লোকজন এবং মাকবুল জান সাহেব একটি খুবই খারাব উদাহরণ ব্যবহার করে থাকেন; আর তা হলো, 'নারকেল' যেমনিভাবে নারকেলের উপরের অংশ দেখতে অসুন্দর কিন্তু তার ভিতরে দবদবে সাদা, তদ্রুপ আমাদের দেশি লোক, যাদের চেহারা তো হিন্দুস্তানি কিন্তু অন্তর সাদা।) সে কারণেই মুনাফিক এবং জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরের কতিপয় লোক কয়েকবার মুসআ'ব ভাইয়ের আক্রমণের শিকার হয়েছিল।

এ সকল আক্রমণে জেনারেল থেকে শুরু করে নিম্নপদস্ত অফিসার, লেফটেনেন্ট এবং ক্যাপ্টেনসহ অনেকেই জাহান্নামে পৌঁছতে থাকে। এই ইন্টেলিজেন্সরা পদমর্যাদায় এমন অবস্থানে, যারা নিজেদের উপরস্থ পদমর্যাদার অধিকারী জেনারেলদেরকেও শাস্তি দেওয়া এবং হত্যা করতেও চিন্তা করেনা, কারণ তারা ঈমানের পথ অবলম্বন করেন।

এখানে বিস্তারিত বলার সুযোগ নেই, তারপরও শহীদ জেনারেল শাহেদ আজিজ সাহেব (আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি স্বীয় রহমত ও দয়া বর্ষণ করুন) তাঁর একটি বড় উদাহরণ, তাকে ঈমানের আহ্বানে লাব্বাইক বলার অপরাধে আই এস আই এর টর্চার সেলে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে।

যখন পাকিস্তানে মুসআ'ব ভাই কর্তৃক আমেরিকার স্বার্থে আঘাতের ব্যাপারে এজেন্সিগুলো জানতে পারল, তখন তারা তাদের সকল উপকরণ নিয়ে তাঁর পিছু নিলো। ইসলামাবাদ থেকে করাচী পর্যন্ত গেরিলা হামলা চালালো, কিন্তু যাকে আল্লাহ তা'আলা বাঁচানোর ফায়সালা করে রেখেছেন, যদি তাকে কাঁটা বিদ্ধ করার জন্যও সমস্ত মানুষ একত্রিত হয়ে যায় তারপরও তা সম্ভব নয়।

**এখনো অনেক সালাহুদ্দীন ও বিন কাসিম বিদ্যমান:**

আমাদের অনেকেই মুহাম্মাদ বিন কাসিম এবং তাঁর ন্যায় অল্প বয়সী বীরদের দেখে গর্ববোধ করে থাকি।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, নিজেদের আশ-পাশে বিদ্যমান বীরদেরকে ভুলে যাই। করাচীর কবি 'আবী মাখুনী' একবার লিখেছিলেন, (কিছুটা পরিবর্তনের সাথে) 'যদি আমরা চিন্তা করি এক একজন 'সালাহুদ্দীন আইয়ূবী' আমাদের এখানে পড়ে আছেন। কিন্তু সে সকল সিপাহীরা নেই, যার সালাহুদ্দীন এর পাশে যখন একত্রিত হলেন, তখন তিনি কুদস বিজয় করে নিয়েছেন। এমনিভাবে মুহাম্মাদ বিন কাসিমদের সাথে এমন অনেকে থাকতেন, যারা শ্রবণ এবং আনুগত্য দ্বারা এবং নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করে মুহাম্মাদ বিন কাসিম বানিয়েছেন।'

একথা দ্বারা মহান বীরদের বীরত্ব এবং ব্যক্তিত্ব অস্বীকার উদ্দেশ্য নয় বরং একথা বুঝাতে যে, মুসআ'ব ভাই থেকে নিয়ে বুরহান ওয়ানী এবং জাকির মুসা পর্যন্ত অনেক ইবনে কাসিম রয়েছে। কেউ প্রসিদ্ধ হয়ে গেছেন, আর কেউ সাধারণদের দৃষ্টিতে আসেননি। আর এ দুনিয়া তো শিক্ষা অর্জনের জায়গা। এটা তামাশার জায়গা নয়, যে প্রত্যেক ইবনে কাসিম মঞ্চে উপস্থাপিত হবে বরং মূল লক্ষ্য তো হলো, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন। চাই ইবনে কাসিমের ন্যায় অবস্থা অর্জিত হোক অথবা একেবারে শেষ কাতারে লড়াই করা অপরিচিত জীবন অতিক্রমকারী মুজাহিদের অবস্থা হোক। এটা তো পরীক্ষার স্থান, ইবনে কাসিম সাকাফী থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত মুসআ'ব ভাই সহ সকলের উদ্দেশ্য তো আল্লাহ তা'আলাকে রাজি করা এবং জান্নাত অর্জন।

যখন মুসআ'ব ভাই শহীদ হয়েছেন, এবং এ সংবাদ উস্তাদ আমাকে শুনিয়েছেন, যার আলোচনা পূর্বের পর্বগুলোতে অতিক্রান্ত হয়েছে। তার পরবর্তী কোন এক দিনে উস্তাদ আমাকে তাঁর কিছু কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ঘটনা শুনালেন। যা শুনে আমার মনেও প্রথম প্রথম সে সমস্ত ধারণা আসল যা পূর্বের গল্পে লিখে এসেছি। এসকল ধারণা আমি যখন উস্তাদের নিকট বলেছিলাম, তখন তিনি শুনে মুচকি হাসছিলেন।

কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে সেই কার্যক্রমের বিস্তারিত এখানে উল্লেখ করছিনা। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার প্রতি আশা রাখি যে, সে দিন অচিরেই চলে আসবে, যে দিন এ বিষয়গুলো চলে যাবে এবং এই কথাগুলো আলোচনা করতে পারব।

মোটকথা, তার বিষয়ে মনে যে সকল কথা ঘুরপাক খাচ্ছে তার কিছুটা বলার চেষ্টা করছি। মুসআ'ব ভাই একবার অস্ত্রে ভরপুর একটি হাইস গাড়ি থেকে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে অস্ত্র নামাচ্ছিলেন। তাঁর দায়িত্ব ছিল যে, তিনি এই অস্ত্রগুলো (ক্লাসিনকোভ) কে ইসলামাবাদের কেন্দ্রে পৌঁছে দিবেন। যেখানে আমেরিকান এবং তাদের পোষা 'নাড়িল' এজেন্সিগুলোর মারকাজ ছিল। আর শুধু ইসলামাবাদের সীমানায় অস্ত্র ভর্তি গাড়ি প্রবেশ করিয়ে দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিলনা বরং সে গাড়ি থেকে বের করে অন্য জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বও ছিল।

অস্ত্রগুলো হাইস এর গোপন জায়গাগুলোতে লুকান ছিল। তিনি গাড়ি নিজের এক আত্মীয়ের ঘরের নিকট দাড় করিয়ে রাখেন এবং অন্য গাড়ি আনার জন্য চলে গেলেন, যে গাড়ি দ্বারা নির্ধারিত স্থানে পৌঁছানো হবে।

তারপর দ্বিতীয় গাড়িটি নিয়ে তিনি কাছাকাছি চলেও আসছেন এবং দ্বিপ্রহর পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন, যে সময় সাধারণত মানুষ 'কাইলুলা' তথা খাবারের পর একটু আরাম করে থাকে। যখন তিনি পরিপূর্ণ নিশ্চিত হলেন যে, ঘরের লোকেরা শুয়ে পড়েছেন, তখন তিনি ঘরের গেইট খুললেন এবং গাড়িটি গ্যারেজের একেবারে সামনে দাড় করালেন এবং গাড়িটির ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলেন। তারপর নেমে পড়লেন, এবং একাকী গাড়িটি ধাক্কা দিয়ে ভিতরে নিয়ে গেলেন, এবং দ্বিতীয় গাড়িটিও এরকম করলেন। তারপর গেইট বন্ধ করে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে এক গাড়ি থেকে অন্য গাড়িতে অস্ত্রগুলোর জায়গা পরিবর্তন করে ফেললেন।

এই তাড়াহুড়া থেকে উস্তাদের একটি কথা স্মরণ হলো, তিনি একটি চমৎকার কথা বলেছেন যে, "তাড়াহুড়া এক জিনিস আর দ্রুততার সাথে কাজ করা অন্য জিনিস। আমরা অধিকাংশ সময় এ দু'টোকে একত্রিত করে ফেলি। তাড়াহুড়া একটি নিন্দনীয় বিষয় (হৈ-চৈ লাগিয়ে দেওয়া) আর দ্রুততার সাথে কাজ করা ঠিক ভিন্ন একটি বিষয়। এবং দ্রুত কাজ করা কখনো কাম্যও হয়ে থাকে।

যাই হোক, মুসআ'ব ভাই অস্ত্রগুলো স্থানান্তর করার পর সেভাবেই গাড়ির ইঞ্জিন চালু করা ব্যতিরেকে বাহিরে বের হয়ে আসলেন। ঘরের গেইট বন্ধ করে দিলেন এবং অস্ত্রগুলো সংশ্লিষ্ট সাথীদের পর্যন্ত নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিলেন। এদিকে কেউ জানতেও পারলোনা যে, অস্ত্রসহ কোন গাড়ি শহরে প্রবেশ করল এবং কোন ঘরে অবস্থান করল আর কোথায় পৌঁছেছে। আলহামদুলিল্লাহ!

মুসআ'ব ভাইয়ের শাহাদাতের আলোচনা 'শাহাদাতে ইসমাঈল' শিরোনামে চলে গেছে। তাঁর শাহাদাতের প্রায় এক বছর পর লেখক নিজ মুরশিদ হযরত উসামা ইবরাহীম গুরী শহীদ এর নিকট বসে ছিল এবং সেখানে মুসআ'ব ভাইয়ের উত্তম আলোচনা হচ্ছিল। তখন মুরশিদ রহিমাহুল্লাহ মুসআ'ব ভাইয়ের কিছু দুর্লভ ঘটনা শুনালেন। উস্তাদের জবানে মুসআ'ব ভাইয়ের সাথে মুরশিদের মোহাব্বতের অবস্থা গত হয়েছে। মুরশিদ বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় দল আল কায়েদা' এর এক সারকারদাহ নেতা শাইখ খালেদ হাবীব শহীদ রহিমাহুল্লাহ সম্ভবত শাইখ আহসান আজিজ শহীদ রহিমাহুল্লাহ (যিনি সে সময় মুসআ'ব ভাইয়ের আমীর ছিলেন) থেকে বাইরের আক্রমণ (বৈশ্বিক আক্রমণ তথা পশ্চিমা দেশগুলোর কাফেরদের বিরুদ্ধে আক্রমণগুলো) এর জন্য তাকে চেয়ে নিয়েছিলেন, অর্থাৎ মুসআ'ব ভাইকে যেন তাঁর দায়িত্বে দিয়ে দেওয়া হয়।

মুসআ'ব ভাই যখন জিহাদের ময়দানে এসেছিলেন, তখন খুবই অল্প বয়সের ছিলেন। আর যেহেতু তিনি এসেছিলেন উস্তাদ রহিমাহুল্লাহর দাওয়াত ও সম্পর্কের ভিত্তিতে। তাই শাইখ আহসান আজিজ তা'লিম- প্রশিক্ষণ হেফাজত এবং খেয়াল রাখার উদ্দেশ্যে মুসআ'ব ভাইকে ফারুক ভাইয়ের দায়িত্বে দিয়ে রেখেছিলেন। এদিকে শাইখ আহসান আজীজ এ বিষয়ে উস্তাদকে জিজ্ঞেস করেন এবং সর্বশেষ মুসআ'ব ভাইকে শাইখ খালেদ হাবীবের দায়িত্বে দিয়ে দিলেন।

মুসআ'ব ভাই এই আক্রমণে ফিদায়ী হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু প্রস্তুতি পরিপূর্ণ হচ্ছিল না তাই মুসআ'ব ভাই এ আক্রমণ বাস্তবায়ন করার জন্য চার মাস অপেক্ষা করেছিলেন। অতঃপর সেই অপেক্ষার ক্ষণেই মারকাজে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে যান ফলে তাকে সবশেষে নিজ ঘরে (যা সে সময় পাকিস্তানের শহরের এলাকায় ছিল) পাঠিয়ে দেওয়া হলো। এরপর পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে আবার জিহাদের ময়দানে ফিরে আসলেন।

সে সময় ফিরে আসার পর মুসআ'ব ভাইকে মুরশিদ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কিভাবে শহীদ হতে চাও, যদি এখনও ফিদায়ী আক্রমণের সুযোগ মিলে যায়, তাহলে কি তুমি ফিদায়ী হামলায় অংশগ্রহণ করবে? উত্তরে মুসআ'ব ভাই বললেন, যদি ফিদায়ী আক্রমণের সুযোগ মিলে যায়, তাহলে অবশ্যই ফিদায়ী হামলায় অংশগ্রহণ করব। কিন্তু আমি চাই ফিদায়ী মুজাহিদ হওয়ার পরও আমাকে কেউ না বলুক যে, তুমি অমুক অভিযানে যাচ্ছ এবং ইস্তিশহাদী হামলা করতে যাচ্ছ (এটা আমীরের আনুগত্যের প্রতি কোন প্রকার শৈথিল্য ছিল না ) বরং আমি চাই এমন সময়ে শহীদ হবো যখন আমার দৃষ্টিতে এটা থাকবে যে, যদি আমি এখনই মৃত্যুকে আল্লাহ তা'আলার জন্য কবুল করে নিতে চাই, তাহলে মৃত্যুকে বেঁছে নিতে পারব। আর যদি জিন্দিগিকে চাই তাহলে তাও বেঁছে নিতে পারব (এটাও স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, আসলে এটা ছিল ঈমানের ইশ্‌ক এবং মাস্তিতে, অন্যথায় বান্দার হাতে জীবন-মৃত্যু নয়। আর মুসআব ভাই এ কথা ভালো করেই জানতেন।)

সুবহানাল্লাহ! যখন আমি মুরশিদের নিকট মুসআ'ব ভাইয়ের এ ধরনের আকাঙ্ক্ষার কথা শুনেছি তখন আমার দুটি কথা স্মরণ হয়েছে। প্রথমটি হলো তাঁর শাহাদাতের দৃশ্য, যা মুজাহিদদের নেতা খুররম সাঈদ কায়ানী (কাসিম ভাই) উস্তাদের নাম নিজের চিঠিতে বর্ণনা করেছেন। এবং যা অন্যদের থেকে শ্রবণ করে উস্তাদ আমার সামনে বর্ণনা করেছিলেন তা হলো, যে আক্রমণে মুসআ'ব ভাই শহীদ হয়েছেন, তার শুরুতেই আহমাদ (সাইয়্যেদ ফায়েজ শাহ রহিমাহুল্লাহ) ভাই জখম হয়েছিলেন, এবং গোয়েন্দাদের মাথার উপর দিয়ে পলায়ন করে চলে এসেছেন। আর সে এলাকাটি ছিল শত্রুদের, তাছাড়া অত্যন্ত মজবুত প্রতিরক্ষা দেয়াল থাকার কারণে হামলা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিলনা। যখন সাথীগণ পিছপা হওয়ার চিন্তা করছিলেন (আর নিঃসন্দেহে এই চিন্তা কয়েক মূহর্তের ছিল), কিন্তু মুসআ'ব ভাই! (কাসিম ভাইয়ের ভাষায়) ব্যগ্রের ন্যায় সেই গোয়েন্দার উপর

ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আমি এই মূহুর্তে তার সকল দৃশ্য কল্পনা করছি এবং কল্পনার চোখে দেখছি। এর সাথে মুরশিদের আলোচনাকে মাথায় রাখছি, ফলে আমার অনুভূতি হয়েছে যে, মুসআ'ব ভাই সে মূহুর্তগুলো 'বাহ্যিক' জীবন অথবা মৃত্যু অর্জন হয়ে গিয়েছিল। এবং কোন এক মূহর্তে তিনি কুরবানি ঈদের দিন নিজের সবচেয়ে দামি কুরবানি করার ইচ্ছা করেছিলেন।

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

অর্থ: তোমরা কিছুতেই পুণ্যের স্তরে উপনীত হতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু হতে (আল্লাহর জন্য) ব্যয় করবে। [সূরা আলে ইমরান ৩:৯২]

এবং আল্লাহর জন্য মৃত্যুকে জীবনের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন, ঐ মৃত্যু যা চিরস্থায়ী জীবনের শুরু।

দ্বিতীয় বিষয় যা তিনি মনে রেখেছেন, যা সম্ভবত আমি প্রথমবার মুসআব ভাইয়ের জবানেই শুনেছি। শহীদ মুজাহিদ কায়েদ ডক্টর আরশাদ ওয়াহীদের ভাতিজা আহলাম ওয়াহীদ শহীদ এর শাহাদাতের উপর একটি ভিডিও নির্মিত হয়েছে। এ ভিডিওতে তাঁর সম্পর্কে কিছু অনন্য আলোচনায় মুসআব ভাইয়ের কথাও রয়েছে। তাতে মুসআ'ব ভাই ঐ বদরী সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কথা শুনাতেন যে, যারা রাসূলে মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন যে, আমি জিহাদের ময়দানে গনিমতের সম্পদ অর্জন করার জন্য আসিনি। বরং আমার তো তামান্না হলো, আমার এখানে (গলায়) তীর লেগে যাবে এবং আমি সেখানেই (জান্নাতে) চলে যাব। আর সে সকল বদরী সাহাবীদের শাহাদাতের পর এমন অবস্থায় পাওয়া গেছে যে, তাদের গলায় তীর বিদ্ধ ছিল।

যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হলো, তখন তিনি ইরশাদ করলেন, (যার সারমর্ম এরকম) সে নিজ রব আল্লাহর সাথে সত্যবাদী ছিল, আল্লাহ তা'আলাও তার সাথে তেমনই আচরণ করেছেন।

মুসআ'ব ভাই (আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি স্বীয় রহমত প্রশস্ত করে দিন) এর সাথেও এমনটাই হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর শাহাদাতকে কবুল করে নিন।

এবং তাঁর এই আলোচনাকে জান্নাতে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি এবং লেখকের গুনাহের কাফফারা হিসেবে কবুল করে নিন, আমীন।

মুরশিদ শহীদ রহিমাহুল্লাহ বলেছিলেন, একবার মুজাহিদগণের রুটিন অনুযায়ী কোন একটি মারকাজ পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব সাথীদের মাঝে বণ্টন হয়েছিল। মুসআ'ব ভাইয়েরও পাহারাদারির দায়িত্ব আসে। কিন্তু মুসআ'ব ভাই পাহারা দিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, আর এভাবে তাঁর আর পাহারা দেওয়া হয়নি। ফলে তাকে আর বাকি রাতগুলোর পাহারাতে রাখা হয়নি।

মুরশিদ বলেন, জামাতের জিম্মাদার মুসআ'ব ভাইয়ের স্বভাব সম্পর্কে জানতেন, তাই এর শাস্তি স্বরূপ মুসআ'ব ভাইকে পরের রাতে পাহারার দায়িত্ব দেননি। কেউ কেউ এ বিষয়ে আনন্দিত ছিল যে, যাক রাত্র জাগরণ থেকে তো বেচে গেলে। কিন্তু পাহারা দেওয়ার ফজিলতের ব্যাপারে (অবগত) তার জন্য এ শাস্তি অনেক বড় ছিল। তাই আমীরের নিকট করজোড়ে মিনতি করে ক্ষমা চাইলেন, এবং পাহারায় নিযুক্ত হলেন।

মুরশিদ আরও বলেছেন যে, বেয়াদব খৃষ্টান রাষ্ট্র ডেনমার্কের সরকার থেকে বদলা নেওয়ার জন্য ইসলামাবাদে অবস্থিত ডেনমার্কের শান্তিরক্ষা (দূতাবাস) এর উপর আক্রমণকারী ফিদায়ী মুজাহিদ আবু গরীব মাক্কিকে ওয়াজিরস্তান থেকে ইসলামাবাদ পর্যন্ত পৌছাতে একজন ব্যক্তি তারপর ইসলামাবাদে মুজাহিদগণের মারকাজ থেকে আক্রমণের কাছ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বশীলদের মাঝে মুসআ'ব ভাই ছিলেন।

কলমের ছোঁয়াতে আঁকা কয়েকটি মাত্র পৃষ্ঠা মুসআ'ব ভাইয়ের হক আদায় করতে পারবেনা। আর আমি তো তাঁর সম্পর্কে অল্পই জানি। মুসআ'ব ভাইয়ের একটি গুণ ছিল, এটি আলোচনা করেই উস্তাদের স্মৃতিচারণের মজলিসের ইতি টানছি। তাঁর সাথীদেরকে নেক কাজের প্রতি উৎসাহ দেওয়া, ধৈর্যের নসিহত দেওয়া। অধিকাংশ সময় মুসআ'ব ভাই অন্যান্য মুজাহিদদেরকে সাক্ষাতের সময় আর সাক্ষাত না হলে চিঠির মাধ্যমে ভালো কাজের প্রতি উৎসাহ দিতেন।

এমনিভাবে বিশেষ সাথীদের যাদের সাথে তার সম্পর্ক হতো, তাদের সামনে নেক কাজের গুরুত্বের উপর আলোচনা করতেন এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে এবং ধৈর্য ধারণের নসীহা করতেন। এ ধরণের চিঠি স্বয়ং লেখককেও

পাঠিয়েছিলেন, আর এমন-ই একটি চিঠির আলোচনা ভাই হাবীব দাউদ ঘুরী (হাফিজাহুল্লাহ) আমার সামনে করেছেন।

একবার আমার উপর কাজের স্তূপ ছিল (অথবা আমার মনে হচ্ছিল ) আমি সময়মত নিজ কাজ সম্পূর্ণ করতে দুষ্কর মনে করছিলাম। তাই এ বিষয়টি আমি দাউদ ভাইয়ের নিকট উল্লেখ করলাম, তখন তিনি তাঁর পকেট থেকে একটি চিঠি বের করলেন এবং আমাকে পড়ার জন্য দিলেন। এটি ছিল মুসআ'ব ভাইয়ের পক্ষ হতে দাউদ ভাইয়ের প্রতি লেখা পত্র, তাতে মুসআ'ব ভাই দাউদ ভাইয়ের প্রতি লিখেছিলেন, একটি হাদিসের সারমর্ম , যে ব্যক্তি চাশতের সময় চার রাকাত নামায পড়ে আল্লাহ তা'আলা তার সময়ের মাঝে বারাকাহ্ দান করেন। এই বরকতের নুসখাকে অনেকেই পরীক্ষা করেছে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন!

আল্লাহ পাক উম্মাহর সকল মুজাহিদদেরকে হেফাজত করেন, এবং তাদের সকলকে উত্তম পরিণতি দান করুন, হে জগত সমূহের প্রতিপালক আপনি কবুল করে নিন!

وما توفيقي الا بالله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

وصلي الله علي نبينا وقرة أعيننا محمد وعلي أله وصحبه ومن تبعهم باحسان الي يوم الدين

# গণতন্ত্র একটি নতুন ধর্ম (দ্বিতীয় কিস্তি)

শহীদ শাইখ হাসান মুহাম্মাদ কায়েদ (আবু ইয়াহইয়া আল লিব্বী) রহিমাহুল্লাহ

**গণতন্ত্র একটি নতুন ধর্ম:**

যখন আমরা গণতন্ত্র বিষয়ে চিন্তা করি, তখন এর বাস্তবতা আমাদের সামনে উন্মোচিত হয় যে, গণতন্ত্র তো একটি পরিপূর্ণ ও পৃথক ধর্ম। অন্যান্য ধর্মের ন্যায় এর নিজস্ব চিন্তা-চেতনা, নিয়ম-নীতি, দৃষ্টিভঙ্গি এবং সক্ষমতা রয়েছে। এই বাস্তবতা জানার পর নিম্নোক্ত বাক্যগুলোর অনিষ্ঠতা এবং নিকৃষ্টতা অধিক স্পষ্ট হয়ে যাবে; বিষয়টি হল এমন, যেমন কেউ বলল, ইহুদী ইসলাম, খৃষ্টীয় ইসলাম, ইসলামী ইহুদী, ইসলামী খৃষ্টান, ইসলামী মূর্তিপূজারী। দুনিয়ার বুকে কোন মূর্খ এবং গোনাহগার মুসলমান এমন পাওয়া যাবে কি যে, এ সকল নাম গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হবে? অথবা নিজের জন্য দ্বীন হিসেবে এগুলোকে পছন্দ করবে? নিঃসন্দেহে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের একজন বৃদ্ধা নারী যার কাছে নব যুগের সংস্কৃতি, কৃষ্টি-কালচারের ছিটো-ফোটাও পৌঁছেনি, তিনিও এই সকল কথা শ্রবণের সাথে সাথে এর অনিষ্ট থেকে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় কামনা করবে। এবং এ সকল বাক্য তার বক্তার মুখের উপর নিক্ষেপ করে দিবে এবং বলবে আমার এরকম কোন দ্বীনের প্রয়োজন নেই। সমুদ্র অথবা মরুভূমিতে ঘাস উৎপন্ন হওয়ার বিষয়টি ঐ মহিলাকে মানানোর চেয়ে এই বিষয়টি মানানো অধিক সহজ হবে। যদি আপনার এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে তাহলে, যাচাই করে দেখতে পারেন।

সুতরাং আমরা গণতন্ত্রকে ইসলামের সাথে একত্রিত করার চেষ্টা কেন করি? অথচ আমরা এটা অত্যন্ত অপছন্দ করি, এবং প্রত্যেক মুসলমান এ কথাকে খুবই অপছন্দ করে যে, ইসলামকে ইয়াহুদিয়্যাত/ইহুদীবাদ, খ্রিস্টবাদ অথবা মূর্তি পূজারীর সাথে একাকার করে ফেলা হোক।

**গণতন্ত্র ইসলামের বিপরীত ধর্ম:**

সুতরাং এ বিষয়টি বুঝা জরুরী যে, গণতন্ত্র সর্বদিক থেকে দ্বীন-ইসলামের বিপরীত এবং ইসলাম বিরোধী ধর্মসমূহের মতই একটি পরিপূর্ণ ধর্ম। গণতন্ত্রের বাস্তবতাকে

জানা এ জন্য আবশ্যক, যেন ঐ সকল লোক যারা এ নতুন ধর্মের বিছানো জালে আটকে আছে, তারা যেন এ বিষয়ের বাস্তবতা বুঝতে পারে যে, এই গণতন্ত্রকে টেনে-হেঁচড়ে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করা, যেন এটি ইসলামের তাওহীদকে গণতন্ত্রের শিরকের সাথে সম্পৃক্ত করার নামান্তর। এবং এটি যেন ইসলামের আলোর সাথে গণতন্ত্রের অন্ধকারকে মিলানোর মহা অপরাধে জড়িয়ে যাওয়া। ইসলামের সুউচ্চ মর্যাদা, পবিত্র স্বভাব ও ন্যায়-ইনসাফের সাথে নিকৃষ্ট গণতন্ত্রের জুলুম-অত্যাচার ও বে-ইনসাফীর কি সম্পর্ক? অন্ধকারের সাথে কি আলোর সম্পর্ক হতে পারে? আল্লাহ তাআ'লার গোলামি ও দাসত্ব (তথা ইসলাম) এবং নফসের গোলামি (তথা গণতন্ত্র) কখনো এক হতে পারে?

## গণতন্ত্রপন্থীদের নিকট কিছু প্রশ্ন:

### ১. গণতন্ত্র শব্দটি কি ইসলামে আছে?

গণতান্ত্রিক ইসলামের দাবিদারদের প্রতি আমাদের প্রথম প্রশ্ন হলো, গণতন্ত্র শব্দটি ইসলামে আছে কিনা এর প্রমাণ দেখাও। এ উদ্দেশ্যে আরবী সকল অভিধানে খোজ কর, সমস্ত আরবী কবিতা পড়ে দেখ। ফসীহ ও বালীগদের মধ্য হতে যার থেকে পার জিজ্ঞাসা কর, বরং গ্রামে বসবাসকারী বৃদ্ধা মহিলাদের থেকে জিজ্ঞাসা করে দেখ এবং গ্রামে বসবাসকারী সবচেয়ে দীর্ঘ-বয়সী ব্যক্তিকে খুঁজে নিয়ে আসো। কোন প্রকৃত আরবী এবং ভাষা সাহিত্যের অভিধানে তুমি ডেমোক্রেসি শব্দটি খুঁজে পাবে না। সাহিত্যপূর্ণ তো দূরের কথা কোন সাহিত্যপূর্ণ নয় এমন কোন অভিধানেও তুমি এই শব্দটি খুঁজে পাবে না। এতে প্রমাণ হল, এটি আমাদের ভাষায় একটি অপরিচিত শব্দ, যা পশ্চিম থেকে আমদানি হয়েছে। উদ্ভাবকদের নিকটে এর একটি বিশেষ পারিভাষিক অর্থ রয়েছে, যার থেকে তাকে পৃথক করা সম্ভব নয়।

### ২. জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস!

আমাদের ভাষায় এই অর্থকে " জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস" এর দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। এই একটি বাক্যের মাঝে গণতন্ত্রের সার-নির্জাস বিদ্যমান, যদি এই অর্থকে

গণতন্ত্র থেকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে গণতন্ত্রের অস্তিত্বই অবশিষ্ট থাকবে না। পুরো গণতন্ত্রের নীতিমালার যদিও অনেকগুলো পথ রয়েছে কিন্তু এ সবগুলোর উৎস একই। অর্থাৎ "জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস" কোন মুসলিম এবং অমুসলিম এই দাবি করতে পারবে না যে, আমি গণতন্ত্রকে মান্য করি কিন্তু তা এই অর্থ থেকে মুক্ত এবং "জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস" কে স্বীকার করি না। যদি কোন বিবেকহীন ব্যক্তি এই দাবি করে তাহলে, তার অবস্থা ঐ ব্যক্তির মতোই হবে যে এ কথা বলে যে, আমি এমন ইয়াহুদিয়্যাতের দিকে দাওয়াহ দিচ্ছি, যা নিজ ভিত্তিমূলক বিষয়াদি হতে মুক্ত। সুতরাং এমন ব্যক্তির দাবিকে সত্যায়ন করা হবে কি? কোন মুসলিম এমন ইহুদীবাদকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হবে? গণতন্ত্র ধর্মে জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস মনে করা হয়। তা এভাবে যে, জনগণের ক্ষমতাই প্রকৃত ক্ষমতা এবং জনগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। গণতন্ত্র নামক ধর্মে জনগণের ইচ্ছাই বাস্তবায়ন হবে এবং জনগণের আইনই চূড়ান্ত এবং সম্মানজনক হবে। এই নীতি অনুযায়ী কারো সাহস নেই যে, সে জনগণের আদেশের উপর আপত্তি করবে, অথবা তাদের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করবে। এতে জনগণ নিজেদের শাসনের মাঝে কারো সামনে জবাবদিহিতা করতে হবেনা।

### ৩. কথাগুলো তিক্ত হলেও সত্য!

আমার এ বিষয়টিও জানা আছে যে, কোন মুসলিম এ বাক্যগুলো পছন্দ করবে না। বরং তা অত্যন্ত অপছন্দ, ঘৃণা এবং নিন্দার দৃষ্টিতে দেখবে, আল্লাহর কসম! এটা ঘৃণারই উপযুক্ত। নিন্দাযোগ্য তো ঐ সকল ব্যক্তি, যারা ইসলামী গণতন্ত্রের ঢোল পিটান এবং জনগণের সামনে এর বাস্তবতা প্রকাশ করেন না, এবং গণতন্ত্রের বিকৃত চেহারার পর্দাও উন্মোচন করেন না। বরং ভুল ব্যাখ্যা এবং হিলা বাহানার মাধ্যমে এর অনিষ্টগুলোর উপর পর্দা দিয়ে একে সুন্দর বলে চালিয়ে দেন। লা হাওলা ওয়ালা কুওওতা ইল্লা বিল্লাহ্।

### ৪. বিধান দেওয়ার মালিক জনগণ?

যেহেতু এটা অসম্ভব যে, সকল জনগণকে এক ময়দানে একত্রিত করে দেওয়া হবে, তারপর তারা একত্রিত হয়ে সকলে বা অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করে নিবে। তাই পশ্চিমা বিশ্ব এই উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্য একটি বিশেষ নীতি প্রণয়ন করেছে। এই নীতিতে সাধারণ মানুষের সন্তুষ্টি এবং মতামতে নির্বাচিত হয়ে তাদের মুখপাত্রের দায়িত্ব পালন করে। আর এ উদ্দেশ্যে পার্লামেন্টকে দায়িত্ব দেওয়া হয়, যেন এর প্রত্যেক সদস্য নিজ এলাকার জনগণের মুখপাত্র এবং প্রতিনিধি হতে পারে। তার মতামত জনগণের মতামত মনে করা হয় এবং তার সিদ্ধান্ত জনগণের সিদ্ধান্ত হিসেবে মেনে নেওয়া হয়।

গণতন্ত্রের আইনে পার্লামেন্টেরই আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ ক্ষমতা হয়ে থাকে। এবং এই পার্লামেন্টের জন্য সর্ব প্রকার আইন প্রণয়নের ব্যাপক স্বাধীনতা থাকে শুধু এই শর্তে যে, সেই আইন যেন সংঘর্ষশীল না হয়। (তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, পাকিস্তানের আইনে পার্লামেন্টের দুই তৃতীয়াংশ তথা অধিকাংশের মাধ্যমে সংশোধন এবং বৃদ্ধি করা যায় -অনুবাদক) এই শর্ত মেনে পার্লামেন্টের জন্য ব্যাপক স্বাধীনতা রয়েছে যে, তা শরীয়ার অনুকূলে হোক বা শরিয়াহ বিরোধী হোক। যার ইচ্ছা আইন প্রণয়ন করবে কেননা এটি জনগণের নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান। আর গণতন্ত্র এ কথাই বলে যে, শাসন ক্ষমতা শুধু মাত্র জনগণের অধিকার। সুতরাং তার উপর কারো প্রশ্ন উত্থাপন করা অথবা টালবাহানা করার অধিকার নেই।

আল্লাহ্ তা'য়ালার বাণী:

**سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ**

অর্থ: তারা যা ফয়সালা করে নিয়েছে তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট। (সূরা আনআম ৬:১৩৬)

পার্লামেন্টের দায়িত্ব হলো আইন প্রণয়ন করা, চাই তার নাম পার্লামেন্ট হোক বা আইন প্রণয়নের এসেম্বলি অথবা ইউনিয়ন প্রতিনিধিত্ব হোক, এ সব একই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন নাম। আল্লাহ তা'আলা যথার্থই বলেছেন,

**مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَ آبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ**

অর্থ: তাঁকে ছেড়ে তোমরা যার ইবাদত করছ, তার সারবত্তা কতগুলো নামের বেশি কিছু নয়, যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদাগণ রেখে দিয়েছে। আল্লাহ তার পক্ষে কোনও দলীল নাযিল করেননি। হুকুম দানের ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নেই। তিনিই এ হুকুম দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁর ভিন্ন অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল-সোজা পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। (সূরা ইউসুফ ১২:৪০)

## গণতন্ত্র ঈমানের পরিপন্থী নয় কী?

যার অন্তরে ঈমানের নূর বিদ্যমান সে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে জানে এই নতুন ধর্ম (গণতন্ত্র) এক মুহূর্তের জন্যও দিল-দেমাগে প্রবেশ করবে না। এবং বাস্তবিক জীবনেও ঈমানের সাথে একত্রিত হতে পারে না। যখন কোন ব্যক্তি এই নতুন ধর্ম (গণতন্ত্র) কে গ্রহণ করে, তখন সে অন্য ধর্মকে জলাঞ্জলি দিয়েই নতুন ধর্মে প্রবেশ করে। যে এই বাস্তবতা জেনে গেছে, সে তো জেনেই গেল। আর যে এই বাস্তবতা থেকে অজ্ঞ রয়েছে, সে তো অজ্ঞই। আর এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট বিষয় যে, অজ্ঞতা মানুষকে ঈমানের সুউচ্চ আসন থেকে উঠিয়ে কুফরির আবর্জনায় নিক্ষেপ করে, কিন্তু সে এ ব্যাপারে খবরও রাখেনি।

এই বাস্তবতা প্রত্যেক এমন ব্যক্তির নিকট স্পষ্ট এবং প্রমাণিত হয়ে গেছে, যে সত্যের প্রতি শত্রুতা এবং বিদ্বেষ রাখে না। কিন্তু অধিক স্পষ্টতার জন্য আমরা গণতন্ত্রের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করতে চাচ্ছি, যেগুলো ইসলাম ধর্মের সাথে পরিপূর্ণ বিরোধ। এর কারণ হলো, আমরা যেন এই বিশাল অপরাধ অনুধাবন করতে পারি, যার দ্বারা গণতান্ত্রিক ইসলামের দাবিদার ইসলাম এবং মুসলমানের মাথার উপর চেপে বসে তাদেরই ধ্বংসের পথের উপর শুধু ধাক্কাতে চাচ্ছে না, বরং ধাক্কাচ্ছে। বর্তমানে শত দুশ্চিন্তা, সন্দেহ, অমঙ্গল আর অশান্তির দাবানল আকারে মুসলিম উম্মাহ এই গণতান্ত্রিক তামাশার স্বাদ আস্বাদন করছে।

## সফলতার চাবিকাঠি:

প্রথমত: ঐ মূলভিত্তি ও নীতিমালা, যার উপর ইসলামী ইমারত দাড়িয়ে আছে আর তা হলো, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের অবতীর্ণ সেই শরিয়তকে শর্তহীনভাবে মেনে নেওয়া। আর এর মাঝে বান্দার জন্য রয়েছে পরীক্ষাও, আর এটাই হলো দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার জন্য কষ্টিপাথর। যদি বান্দা নিজের রবের শর্তহীন আনুগত্য না করে, সে তো বান্দাই হতে পারে না। সুতরাং বান্দার কাজ এটা নয় যে, আল্লাহর হুকুমের সামনে নিজ বিবেকের ঘোড়া দৌড়াবে। নিজ অভ্যাসকে তার উপর প্রাধান্য দিবে, নিজ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আল্লাহর বিধান থেকে বিমুখতা দেখাবে অথবা নিজ মতামতকে আল্লাহ তাআ'লার হুকুমের মোকাবেলায় উন্নত বা সম্মানিত মনে করবে। চাই সে কোন ব্যক্তি হোক বা দল, পার্লামেন্ট হোক বা জনগণ, কোন জাতি হোক বা তানজীম, সকলের উপর আবশ্যক হলো আল্লাহর বিধি-বিধানের সামনে নত হয়ে যাওয়া। এবং তাঁর নাযিল কৃত শরিয়াতকে মন-দিল এবং অন্তরাত্মা দিয়ে মেনে নেওয়া। কোন মুসলমান যতই দাবি করুক অথবা ধারণা রাখুক না কেন সে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলিম হতে পারে না, যতক্ষণ না ইসলামের এই বাস্তবতা তার অন্তরে প্রথিত না হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

**وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا**

অর্থ: তার চেয়ে উত্তম দ্বীন আর কার হতে পারে, যে (তার গোটা অস্তিত্বসহ) নিজ চেহারাকে আল্লাহর সম্মুখে অবনত করেছে, সেই সঙ্গে সে সৎকর্মে অভ্যস্ত এবং একনিষ্ঠ ইবরাহীমের দ্বীন অনুসরণ করেছে। আর (এটা তো জানা কথা যে,) আল্লাহ ইবরাহীমকে নিজের বিশিষ্ট বন্ধু বানিয়ে নিয়েছিলেন। (সূরা নিসা ৪:১২৫)

যখন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন বিষয়ের ফায়সালা করে দিবেন তারপর আর কারো অধিকার থাকেনা। এবং আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সেই ফায়সালাকে মন-প্রাণে তা মেনে নেওয়া এবং এর সামনে নিজ মস্তককে অবনত করে দেওয়া প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

অর্থ: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোন বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা দান করেন, তখন কোন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর নিজেদের বিষয়ে কোন এখতিয়ার বাকি থাকে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করলে সে তো সুস্পষ্ট গোমরাহিতে পতিত হলো। (সূরা আহযাব ৩৩:৩৬)

এটাই হলো ইসলামের মূলনীতি, যার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে আহবান করা হয়েছে। অথচ গণতন্ত্র ধর্মে ইসলামের নিম্নোক্ত মূলনীতিকে একেবারেই নিশ্চিহ্ন করে দেয়। গণতন্ত্রের আইনে বরং সঠিকভাবে বলতে গেলে গণতন্ত্রের ধর্মে মানুষের সর্ব প্রকার ইচ্ছাধিকার অর্জিত হয়। আর যখন কোন আইন পার্লামেন্ট থেকে পাশ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার কোন পবিত্রতা, সম্মান অথবা অবস্থা অর্জিত হয় না।

**গণতন্ত্র শরীয়তকে বিকৃত করে:**

আসমান থেকে অবতীর্ণ আল্লাহর বিধানাবলী যা শ্রবণ করা মাত্রই প্রত্যেক মুসলিম চাই পুরুষ হোক বা নারী, তাদের একথা বলা আবশ্যক হয়ে যায়, আমরা শ্রবণ করলাম এবং মেনে নিলাম। কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে গণতন্ত্র বলে, আমরা এখনও এটাকে দ্বিতীয়বার দেখে নেই।

আলোচনা-পর্যালোচনা হবে, সংশোধন এবং যোজন-বিয়োজন হবে, যার ইচ্ছা মানবে আর যার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করে দিবে। যেন গণতন্ত্র নামক ধর্মে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিধি-বিধানের অধিকার পার্লামেন্টে বাস্তবায়ন করা হবে। উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ তাআ'লা মদ পান হারাম সাব্যস্ত করেছেন, যদি পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত তথা পুরো পৃথিবীতে বসবাসকারী সকল মানব-দানব একত্রিত হয়ে যায়, আর মদ্যপানকে জায়েজ অথবা হারামের ব্যাপারে নতুন করে হিসাব নেয়, তাহলে শুধু এ কারণে তারা অবাধ্য কাফের হয়ে যাবে। চাই এই হিসাব নেওয়ার পর তারা এটাকে হারাম সাব্যস্ত করুক অথবা না করুন!

এটা তো হলো একটি মাত্র মাসআলা, অথচ গণতন্ত্র আল্লাহর সকল বিধি-বিধানের উপর দ্বিতীয়বার ভেবে দেখা, এবং বাতিল করা ও রহিত করার দরজা-জানালা খুলে রেখেছে। পুরো দ্বীন যেন, জনগণের ইচ্ছা এবং ইরাদার অধীন করে দেওয়া হয়েছে। যদি জনগণ তা গ্রহণ করে নেয়, তাহলে এটা পবিত্র ও সম্মানিত এবং ধর্মের যোগ্য বলা হবে। আর যদি জনগণ তা প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে (নাউযুবিল্লাহ) ওজনহীন, অর্থহীন এবং প্রত্যাখ্যাত বলে গণ্য করা হবে। এমনকি গণতন্ত্রপন্থী (কথিত) মুসলিমদের কিছু দাবীদার তো সুস্পষ্ট বলেছে যে, যদি জনগণ নাস্তিক এবং ধর্মনিরপেক্ষতার রাষ্ট্রীয় নীতি পছন্দ করে, তাহলেও তাদের পছন্দের সম্মান করা হবে। আর যদি স্বয়ং জনগণ ইসলামী হুকুমতকে প্রত্যাখ্যান করে দেয়, তাহলেও তাদের পছন্দ এবং ইচ্ছার পবিত্রতা অর্জিত হবে। অথচ কুরআনে হাকিমের ইরশাদ,

**وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ**

অর্থ: প্রতিটি আদেশ আল্লাহ তাআ'লাই দান করেন, এমন কেউ নেই যে, তাঁর আদেশ রদ করতে পারে। (সূরা রা'দ ১৩:৪১)

এর বিপরীত গণতন্ত্র বলে, না হাজার বার নয় (কখনই নয়), বরং জনগণই সিদ্ধান্ত দিবে এবং জনগণের সিদ্ধান্তকে কেউ প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।

কুরআনুল কারীম বলে,

**وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ**

অর্থ: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোন বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা দান করেন, তখন কোন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর নিজেদের বিষয়ে কোন এখতিয়ার বাকি থাকে না। (সূরা আহযাব ৩৩:৩৬)

অথচ গণতন্ত্র বলে, না (কখনই নয়), বরং জনগণকেই সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হবে। সত্য তাই, যা জনগণ গ্রহণ করবে আর বাতিল তাই, যা জনগণ বাতিল করবে। জনগণের এই অধিকার রয়েছে যে, তারা নিজ পছন্দ অনুযায়ী যা ইচ্ছা তা-ই বিধান ও আইন হিসেবে পছন্দ করে নিবে।

কুরআনে কারীমের ইরশাদ,

**إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا**

অর্থ: মুমিনদেরকে যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন, তখন তাদের কথা কেবল এটাই হয় যে, তারা বলে, আমরা (হুকুম) শুনলাম এবং মেনে নিলাম। (সূরা নূর ২৪:৫১)

অথচ গণতন্ত্র বলে, না (কখনই নয়), বরং লোকদেরকে জনগণের ফায়সালার দিকে আহ্বান করা হবে, এর উত্তরে তাদের বলা উচিত,

**سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا**

'আমরা (হুকুম) শুনলাম এবং মেনে নিলাম'

কুরআন মাজীদ বলে,

**وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ**

অর্থ: তিনিই (অর্থাৎ আল্লাহই) আসমানেও মাবুদ এবং জমিনেও মাবুদ এবং তিনিই হেকমতের মালিক, জ্ঞানেরও মালিক। (সূরা যুখরুফ ৪৩:৮৪)

কিন্তু নাউযুবিল্লাহ! গণতন্ত্র যেন আল্লাহ তায়া'লাকে সম্বোধন করে বলে, ঠিক আছে আকাশ তো আপনার কিন্তু জমিন জনগণের এবং এর উপর শাসন এবং ক্ষমতার অধিকার শুধু জনগণের । আল্লাহ তাআ'লা যথার্থই বলেছেন,

**وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ**

অর্থ: তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই এমন যে, তরা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখলেও তা এভাবে যে, তাঁর সঙ্গে শরীক করে। (সূরা ইউসুফ ১২:১০৬)

আল্লাহর কসম! গণতন্ত্র কুরাইশ এবং আরবের ধ্বংসপ্রাপ্ত পথের যাত্রী, যারা হজ্জের সময় বলত:

**لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك له الا شريك هو لك تملكه وما ملك**

“আমরা উপস্থিত হে আল্লাহ! আমরা উপস্থিত! আপনার কোন শরীক নেই সে শরীক ব্যতীত আপনিই যার মালিক এবং তার ইচ্ছাধিকারও আপনার মালিকানায়।

**শরীয়তের ফয়সালা-ই একমাত্র ফয়সালা:**

কুরআন মাজীদ অত্যন্ত খোলাখোলিভাবে হাকিমিয়্যাতের (বিধান-দানের অধিকার) মাসআলার বাস্তবতা বর্ণনা করেছে;

**فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا**

অর্থ: না, (হে নবী!) তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না নিজেদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিভেদের ক্ষেত্রে তোমাকে বিচারক মানে, তারপর তুমি যে ফায়সালা দাও, সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনোরূপ কুণ্ঠাবোধ না করে এবং অবনত মস্তকে তা গ্রহণ করে নেয়। (সূরা নিসা ৪: ৬৫)

এই আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে কতক উলামা বলেন, দুই ব্যক্তি নিজেদের ঝগড়ার বিষয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদালতে নিয়ে আসে। এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হকদারের হকের ব্যাপারে ফায়সালা দিয়ে দিয়েছেন। তারপর যার বিরুদ্ধে ফায়সালা হয়েছে সে বলল, আমি এই ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট নই। অন্যজন প্রশ্ন করল তাহলে তুমি কি চাও? তখন সে বলল, আবু বকর সিদ্দীক রাযিআল্লাহু আনহু দ্বারা ফায়সালা করাতে চাই। তারা দুজন তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিআল্লাহু আনহুর নিকটে চলে গেল এবং যার পক্ষে ফায়সালা হয়েছিল সে বলল, এই ঝগড়ার সিদ্ধান্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পক্ষে করে দিয়েছেন। আবু বকর সিদ্দীক রাযিআল্লাহু আনহু বললেন, যে ফায়সালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করে দিয়েছেন সেটাই তোমাদের জন্য উত্তম।

কিন্তু দ্বিতীয়জন এবারও সন্তুষ্ট হতে পারলো না। এবং বলল আমরা উমর বিন খাত্তাবের নিকট যাবো। সুতরাং তারা দু'জন সায়্যেদুনা উমর রাযিআল্লাহু আনহুর

নিকট চলে গেল। এবং যার পক্ষে ফায়সালা হয়েছিল সে বিষয়টি বিস্তারিত বলল, এই ঝগড়ার সিদ্ধান্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পক্ষে করে দিয়েছেন, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পারে নাই। তারপর আমরা আবু বকর সিদ্দীক রাযিআল্লাহু আনহুর নিকট গিয়েছিলাম। তখন তিনি বললেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের জন্য যে ফায়সালা করে দিয়েছেন সেটাই উত্তম। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ তাঁর কথাও মানতে নারাজ। উমর ফারুক রাযিআল্লাহু আনহু দ্বিতীয় পক্ষকে জিজ্ঞাসা করলেন, বিষয়টা কি এমনই? সে স্বীকার করল (হ্যাঁ)। উমর রাযিআল্লাহু আনহু নিজের ঘরে চলে গেলেন। যখন ফিরে আসলেন তখন তাঁর হাতে ছিল নাঙ্গা তরবারি, যা দ্বারা তিনি ঐ ব্যক্তির শিরশ্ছেদ করে দিলেন। এবং বললেন, যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট নয়, তার জন্য আমার ফায়সালা এমনই। তখন তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন,

**فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا**

অর্থ: না, (হে নবী!) তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না নিজেদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিভেদের ক্ষেত্রে তোমাকে বিচারক মানে, তারপর তুমি যে ফায়সালা দাও, সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনোরূপ কুণ্ঠাবোধ না করে এবং অবনত মস্তকে তা গ্রহণ করে নেয়। (সূরা নিসা ৪: ৬৫)

সুতরাং যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফায়সালার প্রত্যাখ্যানকারী এক ব্যক্তির ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা এই শাস্তির ফয়সালা প্রকাশ করলেন। অথচ এই ব্যক্তি শুধুমাত্র একটি বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালার প্রত্যাখ্যানকারী ছিল আর সে বিষয়টি নিয়ে এমন ব্যক্তিদের নিকট গিয়েছিল, আর পরবর্তী বিচারের জন্য এমন মহান ব্যক্তির নিকট গিয়েছিল যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর শ্রেষ্ঠ। সুতরাং ঐ সমস্ত লোকদের ব্যাপারে অবস্থা কি হবে যে গণতন্ত্র নামক ধর্মের দিকে আহ্বান করে। অথচ গণতন্ত্র ধর্মে পুরো ইসলামকেই জনগণের ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হয়েছে। যদি জনগণ চায় তাহলে তা কার্যকর হবে।

এই নিকৃষ্ট গণতন্ত্র ধর্মে আল্লাহ তাআ'লার অকাট্য বিধান যেমন মদ, জিনা এবং অশ্লীলতার স্বাধীনতাও পার্লামেন্টের সামনে পেশ করা হয়। যাতে তারা চিন্তা করতে পারে যে, এ বিষয়গুলোকে হারাম করা উচিত নাকি বৈধ করা।

আল্লাহ তাআ'লার বিধি-বিধানের উপর দ্বিতীয়বার দৃষ্টি দানকারী এই পার্লামেন্ট কে? সে কি আবু বকর এবং উমর রাযিআল্লাহু আনহুম নাকি এদের থেকেও পবিত্র এবং নেককার? আল্লাহর আশ্রয় চাই! মুত্তাকী এবং নেকারদের এই পার্লামেন্টের সাথে কি সম্পর্ক। এটা তো দুনিয়ার নিকৃষ্ট এবং মূর্খ ব্যক্তিরা, যারা হাজারো গুনাহ-পাপাচারে লিপ্ত থাকে। তাদের থেকে বাহ্যত কিছুটা ভালো লোক তারা যারা ইসলামী দলগুলোর সাথে সম্পর্ক রাখে। এবং বলে আমরা তো কল্যাণকামী, কিন্তু আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন:

**أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ**

অর্থ: মনে রেখ এরাই বিশৃঙ্খলা বিস্তারকারী কিন্তু এর উপলব্ধি তাদের নেই। (সূরা বাকারা ২:১২)

**চলবে ইনশা আল্লাহ .....**

# কিছু চিন্তা, কিছু মতামত

মুঈনুদ্দীন শামী

**[গত ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল-২০২১ ইংরেজি পর্যন্ত সমসাময়িক কিছু বিষয়ের উপর লেখকের গুরুত্বপূর্ণ কিছু চিন্তা ও কিছু মতামত।]**

আমরা আল্লাহ তায়ালার খুব সামান্য শুকরিয়াই আদায় করি। অথচ তিনিই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর বান্দাদের মধ্যে সবচে বান্দা (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উম্মত বানিয়েছেন। আল্লাহ যেন আমাদেরকে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তাঁর শ্রেষ্ঠ বান্দা (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর তরিকায় পরিচালিত করেন এবং তাঁর রাস্তায় শাহাদাতের মাধ্যমে উত্তম পরিণতি দান করেন। আমিন।

**আমরা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করি না:**

কয়েক সপ্তাহ পূর্বে শয়তানের পূজারী আমেরিকার বিস্ময়কর কিছু টেকনোলোজি দেখে আমার মনে ভীতি সৃষ্টি হয়েছিলো। আলহামদুলিল্লাহ! পরবর্তীতে দয়াময় আল্লাহ তায়ালা ঈমান ও প্রশান্তির মাধ্যমে অন্তর থেকে এ ভয়কে দূর করে দিলেন।

প্রথমত আমার মনে হল যে, আমেরিকা ও বর্তমান কুফুরী শাসন ব্যবস্থা মুসলিমদের তুলনায় কতই না শক্তিশালী? তাদের কাছে কত ধরনের টেকনোলজি ও উপকরণ রয়েছে? তাদের আছে স্যাটেলাইট ও দ্রুতগামী ড্রোন, যা প্রতি মুহূর্তে পর্যবেক্ষণ করছে। জি.পি.এস.(GPS) এবং আর.এফ.আই.ডি (RFIDs) এর মত (অবস্থান নির্ণায়ক) প্রযুক্তি, যেটি প্রতি মুহূর্তে আপনার লোকেশন সম্পর্কে অবগত হতে পারে। এমন ডিভাইস (যন্ত্র) যেটি আপনার প্রতি সেন্টিমিটারের নড়া-চড়া পর্যবেক্ষণ করতে পারে। (bugging devices) বাগিং ডিভাইস, যেটি আপনার নির্জন রুমের কথাও শুনতে পায় (সংরক্ষণ করে)। লন্ডন পার্ক লাইনের এপার্টমেন্টগুলো, নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটন ও স্কাই লাইন শহর, প্যারিস ও টোকিও এর শহরগুলো বাহ্যত মানুষকে এক নতুন জীবন দান করেছে। তারাই মানুষকে দিয়েছে, মিসাইল ও ভয়াবহ ডেইজি কাটার বোমা।

এসব চিন্তা করে অন্তরে এক ধরণের ভয় সৃষ্টি হল: তারপর কে যেন মনে মনে বলল যে, আরে এ তো আমেরিকা, আল্লাহ নয়। আল্লাহ তায়ালার তো তোমাদের লোকেশন জানতে জি.পি.এস. এর প্রয়োজন হয় না। (و هو معكم اين ما كنتم) তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সাথেই রয়েছেন। তিনি (তোমাদেরকে) দেখার জন্য ক্যামেরার প্রয়োজন নেই এবং শুনার জন্য 'বাগিং ডিভাইস' এর প্রয়োজন নেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। তিনি এই পার্থিব জীবনের চাকচিক্যকে ধোঁকার ঘর ও মাকড়শার জাল বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং আখেরাতের জীবনকে বলেছেন চিরস্থায়ী।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

**وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ**

অর্থ: এই পার্থিব জীবন খেলাধুলা ছাড়া কিছুই নয়। বস্তুত আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত। (সুরা আনকাবুত-২৯:৬৪)

মৃত্যু দেওয়ার জন্য তার মিসাইল (ক্ষেপণাস্ত্র) এর প্রয়োজন নেই। আমেরিকা যদি খোদা হতো, তবে সে এসব কাজ মাধ্যম ছাড়াই করে ফেলত। আসবাবের মুখাপেক্ষী হওয়াই তো তুচ্ছতা ও অপদস্থতার নিদর্শন এবং সৃষ্টি-জীব হওয়ার প্রমাণ।

অদৃশ্যের এই কথা শুনে অন্তর থমকে গেলো। ভয়ে দু'চোখ অশ্রুসিক্ত হয়েছে সত্য, তবে এই ভয়ের উৎস নিজে নিজেই পরিবর্তন হয়ে গেল।

**فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ**

অর্থ: সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না। আর তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তবে আমাকে ভয় কর। (সুরা আলে ইমরান-৩:১৭৫)

**আমাদের ধৈর্য তোমাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিবে!**

আমরা তাওহীদবাদী উম্মত, কুরআনের বাহক, সুন্নতের উত্তরাধিকারী, আমাদের ইতিহাস হল সত্যের পথে টুকরা টুকরা হয়ে যাওয়া, এভাবে পুনরায় ঘুরে দাঁড়ানো। আমরা জিহাদের ময়দানে লড়াকু জাতি। আমরা ধৈর্য ও সহনশীল জাতি। আমরা ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী। আমরা বড় বড় তাগুত ও ফেরাউনদের দম্ভ অহংকার মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছি। আমাদের অবিরাম ধৈর্য শত্রুর জন্য অপদস্থতা, লাঞ্ছনা ও পরাজয়ের কারণ।

কিছুদিন পূর্বে আমেরিকা ঘোষণা করল যে, তারা পূর্বের চুক্তিমতে নির্দিষ্ট সময়ে আফগান হতে বের হবে না। আমেরিকার এই ঘোষণার পিছনে যে গোপন ষড়যন্ত্র লুকায়িত ছিল তা তারা জানে। তবে আমেরিকার এটাও মনে রাখা উচিৎ যে, তার প্রতিটি ইচ্ছা অকার্যকর হবে এবং এই তাগুত তার পূর্বসূরি সকল তাগুত হতে বেশি অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হবে।

কবিতা:

**ہمارا صبر تجھے خاک میں ملا دے گا**

আমাদের ধৈর্য ও অবিচলতা তোমাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে।

**ہمارے صبر کا تجھ کو اثر نہیں معلوم**

তোমার জানা নেই, কেমন হতে পারে আমাদের ধৈর্যের প্রতিক্রিয়া।

**আমেরিকার প্রতি বিশেষ নোটিশ: আফগানিস্তান, ইয়েমেন ও সোমালিয়া আমেরিকার কবর রচিত হওয়ার ভূমি।**

ক্রুসেডার আমেরিকা, ফ্রান্স, ব্রিটেন ও জার্মান একথা ভালোভাবেই জানে যে, দোহার চুক্তি কোন দুর্বল বিষয় নয়। বরং তালেবানদের বৃহৎ শক্তির প্রমাণ বহন করে। মূলত; তারা এক বছর যাবত আফগানিস্তানে নিরাপত্তার সাথে অতিবাহিত করতে পেরে ভুল ধারনার শিকার হয়েছে (তারা ভেবেছে তালেবানরা নিজেদের শক্তির দুর্বলতার কারণে গত এক বছর আমেরিকার কোন ক্ষতি করতে পারেনি)। আমেরিকা আফগান হতে বের না হওয়ার ঘোষণার পর আফগানে অবস্থিত গুল মোহাম্মদের সাথে আমার কথাবার্তা হল। তিনি আমাকে জানালেন যে, আমেরিকা

আফগান ভূমি থেকে না যাওয়ার ঘোষণার পর মুজাহিদরা এত আনন্দিত হয়েছে যে, একে অপরের সাথে খুশিতে কোলাকুলি করতে লাগল। তাদের মনোভাব এমন যে, আমেরিকা যদি না যায়, তাহলে বর্তমান তাগুত আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদের মাধ্যমে বড় প্রতিদান ও শাহাদাত অর্জনের সুযোগ পুনরায় পাওয়া যাবে। এই আনন্দ এ জন্য নয় যে, ঈমানদার শরীয়তসম্মত কোন চুক্তি ভঙ্গ করতে আগ্রহী বরং এই আনন্দ এ জন্য যে এই মুজাহিদগণ মৃত্যুকে জীবন থেকে বেশি ভালোবাসে। এক্ষেত্রে শুধু নিজের মৃত্যু নয় বরং তারা ওয়াদা খেলাফকারী ঐ সকল কাফেরদের হত্যা করেও আনন্দিত হয়, ইমারতে ইসলামীয়ার সাংগঠনিক ঘোষণা অনুযায়ী যারা গত তের মাসে বার শ'রও বেশি ঘটনা ঘটিয়েছে যা ছিল সম্পূর্ণ চুক্তির বিপরীত।

প্রকৃত অবস্থা হল; টনে টনে বারুদ ভর্তি হাম্ভী ও বাইশ চাকা বিশিষ্ট ট্রাকের উপর বসে মুজাহিদরা কাফেরদের জান ছিনিয়ে নেয়ার আগ্রহে এবং নিজের কাঙ্ক্ষিত অর্জন শহীদী মৃত্যুর আশায় আনন্দ প্রকাশ করছে।

হে আমেরিকা! মনে রেখো, এটি ইসলামের সম্মানের যুগ, যদি তোমাদের সৈন্যদের কবরস্থান আফগানিস্তানে বানাতে চাও তাহলেই আগ্রহের সাথে আফগানে অবস্থান কর। মোল্লা মোহাম্মাদ ওমরের উত্তরসুরিরা তোমাদের সেই মৃত্যুর আশা পূরণ করে দিবে।

জো বাইডেন ঘোষণা করল যে, "আমরা আফগানে সর্বদা থাকার জন্য আসিনি, একটি স্পষ্ট মিশন নিয়ে এসেছি। আমাদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে, আমরা তার প্রতিশোধ নিতে ও আল কায়দার অস্তিত্বকে শেষ করার জন্য এসেছি। কিন্তু ফলাফল কি দাঁড়িয়েছে? বর্তমানে আল কায়দা ইয়েমেন ও সোমালিয়ায় পূর্বের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়েছে"। যারা জো বাইডেনের মেজাজ সম্পর্কে অবগত রয়েছেন এই ঘোষণার পরে তারা ঐ খবরের সাথে এতটুকু বৃদ্ধি করে দিতে পারেন যে, " একথা বলার পর সে(জো বাইডেন) কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে"।

আমেরিকার জন্য শুধু আফগানিস্তানে কবর রচনা করা যথেষ্ট নয়, তার জন্য ইয়েমেন ও সোমালিয়ায়ও হাজার হাজার কিলোমিটারের কবরস্থান প্রয়োজন। মনে করেন যে, এটার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।

আমেরিকা ঘোষণা করলো যে, তারা কাবুলে একটি দূতাবাস চালু রাখতে চায়। আমেরিকার দূতাবাসের লক্ষ্য কি তা পুরো বিশ্বের কাছে অজানা নয়। তবে এই দূতাবাস চালু রাখার ঘোষণা দেয়ার পর আমি বন্ধুবর গুল মুহাম্মদের মাধ্যমে জানতে পেয়েছি যে, আমেরিকা এপ্রিলের বাইশ তারিখে কাবুল শহরে দশ মিলিয়ন ডলার মূল্যের সিসি ক্যামেরা লাগিয়েছে এবং দোহা চুক্তির পরও ছুটিতে থাকা শত শত দোভাষীকে দ্বিতীয় বারের মত কাবুলে ফিরিয়ে এনেছে। যাদের কাজ হল, আমেরিকান ছাপাখানায় স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে আমেরিকান সৈন্যদের কথাবার্তার অনুবাদ করা।

**পাকিস্তানি বাহিনীকে অপমান করার বিরুদ্ধে আইন:**

পাকিস্তানের প্রত্যেক নেতৃত্ব তাদের শাসনকালে প্রণীত আইন-কানুন, পার্লামেন্ট ইত্যাদির পবিত্রতার কথা বর্ণনা করে থাকে। কিন্তু সাধারণ পর্যবেক্ষণ হল তাদের এসব পবিত্রতার দাবি, বুলি আওড়ানো একটি ধোঁকা মাত্র। এই সংবিধানের পবিত্রতা ছদ্মবেশী কুশ্রী গাভীর মত। যাকে গাভী বলার চেয়ে জঙ্গলি ষাঁড় বলা অধিক উপযুক্ত। কেননা গাভী তো দুধ দেয়, মানুষ তার দ্বারা অনেক উপকৃত হয়।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাস্তবেই ষাঁড় প্রকৃতির। তাদের চামড়া হাতি ও গণ্ডারের চামড়া হতেও মোটা। যারা বিভিন্ন অঞ্চলে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চরে বেড়ায়, আবার কখনো কখনো এক ইউনিট অন্য ইউনিটের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়।

এসব ষাঁড়দেরকে লক্ষ্য করে ষাঁড় প্রধানের (যার নাম 'কিয়ানী') একটি বক্তব্যে দেখা যায় যে, সে বলছে; তোমাদের মেসে প্রত্যেক সদস্যের জন্য প্রতিদিন চায়ের পাতার পরিমাণ দশ গ্রাম হতে বাড়িয়ে বার গ্রাম করে দেওয়া হল এবং দৈনিক আধাপোয়া দুধ অতিরিক্ত পাবে, যাতে যুবকরা বেশী চা পান করতে পারে এবং প্রতিজনকে আধাপোয়া গোস্ত অতিরিক্ত দেয়া হবে। প্রত্যেকে দৈনিক তিনটি করে অতিরিক্ত রুটি পাবে। এতটুকু শুনেই প্রতিটি যুবক সৈনিক সন্তুষ্ট হয়ে শ্লোগান দিতে দিতে বেহুশ হয়ে পড়ে। মেট্রোপলিটন পুলিশ, নগররক্ষী বাহিনী, বিমান বাহিনী, ফৌজিসহ সকল বাহিনীর জন্যই রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে রয়েছে ব্যাপক রসদের

ব্যবস্থা, তবুও তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা মিটে না। এই মানুষরূপি ষাঁড়গুলো নিজেদের সুযোগ-সুবিধা ও আরাম-আয়েশের জন্য সব ধরণের ব্যবস্থা করে রেখেছে।

কিন্তু তারা এতটাই সংবেদনশীল যে, যদি কেউ তাদের বিরুদ্ধে সামান্য উচ্চবাচ্য করে তখন তার বিরুদ্ধে চারদিক থেকে প্রতিবাদের আওয়াজ উঠতে থাকে। এমনকি আইন করা হয়েছে (যেটি ২০২১ এর এপ্রিলে প্রস্তাবিত) সেনাদের বিরুদ্ধে যারাই কথা বলবে তাদের দুই বছর বন্দী এবং দুই লাখ রুপির সাজা ভোগ করবে হবে। জালেম যখন তার জুলুমের সীমা অতিক্রম করে, তখন তার ঔদ্ধত্য অনেক বেড়ে যায়। আন্তর্জাতিক এসকল আইন সংশোধন ও নতুন নতুন আইন প্রণয়ন মূলত এ ধরণের অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাচারীকে নিরাপত্তা দেয়ার জন্যই তৈরি।

আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রতিটি বস্তুর সময়সীমা নির্ধারিত আছে। তিনি প্রতিটি বস্তুকে সময়, স্থান, শুরু-শেষের সীমায় নির্ধারিত করেছেন। তেমনিভাবে সকল জুলুমেরও শুরু-শেষ আছে। জালিমের জুলুম প্রতিহত করা হোক বা না হোক, এক সময় তার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। ফেরাউন, নমরুদের ক্ষেত্রে কারো ধারণা হল যে এটি পূর্ববর্তীদের ঘটনা, বর্তমানে এমন লোক নেই। কিন্তু বর্তমানে এমন কিছু দায়িত্বপ্রাপ্ত তাগুত রয়েছে যারা ফেরাউন নমরুদকেও হার মানিয়েছে। তাদের একজন হল 'জেনারেল ইহতেশাম জমির', যার থেকে বাহ্যিকভাবে কেউ ড. আফিয়া সিদ্দিকিকে অপহরণের বদলা নিতে পারেনি। কিন্তু সে ছাড়ও পায়নি। একদা সে গালফ খেলে ঘরে ফিরে আসলে বাতি জালাতেই সুই গ্যাসের আঘাতে সে ছাই হয়ে গেল। তাকে উফ বলারও সুযোগ দেয়া হয়নি। নেক মুহাম্মদ শহীদ রহিমাহুল্লাহ'র সাথে চুক্তিতে প্রতারণাকারী 'জেনারেল সফেদার' এরও তেমনি অবস্থা হয়েছে। সে এখন ইউরোপের হাসপাতালে মস্তিষ্কের ক্যান্সারের চিকিৎসাধীন আছে। পারভেজ মোশাররফের দু'ধরণের ভিডিও আমাদের কাছে আছে। একটি ভিডিও তে দেখা যাচ্ছে যে, সে মজবুত কমান্ড দিচ্ছে, তার মুখে সিগারেট, খুব সহজে হাত দিয়ে একজন সৈন্য হতে 'মেকারুপ' পিস্তল নিচ্ছে, তারপর হাত উঁচু করে গুলি চালাচ্ছে, কিন্তু গুলি করার সময় তার হাতগুলোতে সামান্যতম কম্পনও দেখা যায়নি। 'এস.এস.জি. কমান্ডো' অস্ত্র ফায়ার করার সময় তো তার চোখের পলকও নড়ে না। এতে বুঝা যায় সে অনেক ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল।

কিন্তু এর বিপরীতে আমাদের কাছে তার অন্য আরেকটি ভিডিও রয়েছে, যাতে দেখা যায় যে, সে হৃদরোগে আক্রান্ত। তার শিরাগুলো উঠা নামা করছে। সে যন্ত্রণায় ছটফট করছে। (এটিই যামানার ফেরাউনদের শেষ পরিণাম)।

তাই বাস্তবতা হল জুলুমেরও নির্ধারিত সীমা আছে। লেখক-পাঠক হয়তো শক্তিশালী নয়। কিন্তু পরিণাম ফলের সৃষ্টিকর্তা (আল্লাহ তায়ালা) অনেক শক্তিশালী, যিনি লেখক-পাঠকের অভিভাবক। আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ায় স্বাভাবিক কিছু পদ্ধতি চালু রেখেছেন, কিন্তু কখনো কখনো প্রয়োজনে তিনি ক্ষমতার রশি টেনে ধরেন।

একজন মুজাহিদ সাথী একদিন শুনালেন যে, তিনি যখন 'আই.এস.আই.' এর জেলখানায় বন্দি ছিলেন, তার রুমের বৃদ্ধ হাবিলদার 'সেন্ট্রি' অনেক বড় জালিম ছিল। তিনি বলেন, আমি একদিন তার কাছে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস চাইলাম, সে দিল না, তখন আমি আমার শিকলবদ্ধ দুই হাত উঠালাম এবং তাকে বললাম; আমি তোমার জন্য বদদোয়া করব। সে আমার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে চলে গেল। পরের দিন আসেনি। অতঃপর চতুর্থ দিন আসল, এসেই আমার পায়ে পড়ে গেল আর বলতে লাগল, আমাকে মাফ করে দাও, তুমি আমার জন্য বদদোয়া করেছ। আমি বললাম; আমি তো বদদোয়া করিনি। সে বলতে লাগল, ঐ দিন হাত উঠিয়ে করেছো। আমি বললাম; না, আমি তো এমনিতে হাত উঠিয়ে ছিলাম, বদদোয়ার কথা আমার স্মরণ নেই। সে বলতে লাগল যে, কয়েক বৎসর হয়েছে বিবাহ করেছি, দীর্ঘ দিন কোন সন্তান হয়নি। কিছু দিন পূর্বে একটি সন্তান হয়েছে, কিন্তু যে দিন তুমি বদদোয়া করে ছিলে সে দিন আমার সন্তানটি মারা যায়।

নতুন নতুন আইন বানিও না, আল্লাহর আইনের প্রতি সতর্ক থেকো। জালিম হাবিলদার 'সেন্ট্রি' হতে শুরু করে হাবিলদার, কর্নেল, লেপ্টেনেন্ট জেনারেল পর্যন্ত সকলে গিয়ে নিজেদের কয়েদখানায় যাচাই করুক, বন্দি অলিদের লিস্টি দেখুক, তারপর নিজেদের সন্তান গণনা করুক। নিজেরও হিসেব করুক। মনে রাখতে হবে আল্লাহর নিকট ঐ ঝুলে থাকা হাতগুলোর অনেক মর্যাদা রয়েছে। আর এই অপরাধগুলোর শাস্তি বিলম্বিত হলেও মাফ হয় না।

**আমেরিকা যা চায় তাই কি ইনসাফ?**

আনুমানিক নয় মাস পূর্বে ব্রিটেনে জন্ম নেয়া পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ('আইচি সন কলেজ এবং লন্ডন ইকোনমিক্স স্কুলের শিক্ষার্থী) 'আহমদ উমর শায়খ'কে সাংবাদিক 'ড্যানিয়েল পার্ল' হত্যা মামলায় নিরপরাধ ঘোষণা করেছে সিন্ধুর হাইকোর্ট।

এই ঘোষণার পর সর্বপ্রথম সিন্ধুর সরকার তথা পিপলস পার্টি এই বিষয়ে হইচই শুরু করে দিলো এবং তাকে ফাঁসানোর জন্য আইনি ফাঁক ফোকর তালাশ করতে লাগলো (আইনকে দোষারোপ করল)। এক পর্যায়ে সরকার এই মামলার বাদী হল। কিন্তু আদালত তাদের নীতি অনুযায়ী পূর্বের ফয়সালার উপর স্থির ছিল। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসাবাদের পরও আহমদ উমর শায়খের পক্ষে ফয়সালা এসেছে।

পরবর্তীতে মামলাটি পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টে হস্তান্তর হয়। ২০২১ জানুয়ারির শেষ দশকে পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্ট সিন্ধুর সুপ্রিম কোর্টের পূর্বের ফয়সালাকে বহাল রেখে আহমদ উমর শায়খকে নির্দোষ বলে রায় দেয়। রায় ঘোষণার পর ঐ দিনই আমেরিকা বিবৃতি দিল যে, 'ড্যানিয়েল পার্ল' হত্যা মামলার মূল আসামী আহমদ উমর শায়খকে মুক্তি দেয়ার ব্যাপারে আমাদের সংশয় রয়েছে। যদি পাকিস্তান চায় তাহলে আমরা এই মামলা আমেরিকার আদালতে পরিচালনা করতে পারি। তখন পাকিস্তানের সরকার ও আদালতের পক্ষ হতে পুনরায় বলা হল যে, আইনি ফাঁকফোকর দেখা হোক এবং আহমদ উমর শায়খের মামলা দ্বিতীয় বার পর্যবেক্ষণ করা হোক। আর এটি F.I.T.F এর তত্বাবধানে হবে। তার মানে হল যদি এই বিষয়ে আমেরিকার পক্ষে আইন কানুন না থাকে তাহলে প্রয়োজনে তাদের স্বার্থে নতুন আইন তৈরি কর।

**আমেরিকার ইনসাফের এই মাপকাঠির উপর কিছু পর্যালোচনা:**

১. যে ব্রিটিশদের হাতে পাকিস্তান আদালতের আইন কানুন বানানো হয়েছে তাদের হাতেই আমেরিকা অস্তিত্ব লাভ করেছে। পাকিস্তানের আইন-কানুনের একটি বড় অংশ, আদালতের অনেক বিধি নিষেধ, আইনি বর্ণনা ও ব্যাখ্যা ব্রিটিশ আইন কানুনের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। এই শাসন শরয়ী শাসন নয়, যাতে কুরআন সুন্নাহ, মুজতাহিদ, আলিম, ফকিহগণের মতামত ও ব্যাখ্যা গ্রহণীয় হবে, যে শাসনের কথা শুনে আমেরিকার মতো সুপারপাওয়ার রাষ্ট্রগুলোর হৃদকম্পন সৃষ্টি হবে।

২. পাকিস্তানের এই মানব রচিত আইন ইসলাম বিদ্বেষী রামাশা এবং আসিয়া বিবির মত খ্রিষ্টানদের জন্য রহমত। আর এটিকে আমেরিকাও রহমত মনে করে। ইসলাম বিদ্বেষীদের পক্ষে ফয়সালা করলে পাকিস্তানের জর্জদেরকে বাহবা দেয়া হয়, সাহসী সিদ্ধান্ত বলে আখ্যা দেয়া হয়।

৩. এত কিছুর পরও পাকিস্তানি উচ্চ আদালত যখন দীর্ঘ দুই যুগের মত বন্দী আহমদ উমর শায়খের মুক্তির ফয়সালা করে দিল, অবশ্যই সেটি তারা তাদের বিদ্যমান আইনের সর্বোচ্চ পর্যালোচনা করেই সিদ্ধান্ত দিয়েছে। আর ঐ সকল আদালত ও বিচারকদের থেকে ইসলাম ও জিহাদের পক্ষে রায় দেয়ার আশা করাটা পাঠা ছাগল হতে দুধের আশা করার মত (এসব বিষয়ের হিসাব আল্লাহ তায়ালা পরিপূর্ণভাবে আদায় করে নিবেন)। আর মুমতাজ কাদেরি (যিনি মালাউন 'সালমান তাসীর'কে ইসলাম বিদ্বেষীদের পক্ষ নেয়ার কারণে হত্যা করেছে।) ইসলামের দৃষ্টিতে প্রশংসনীয় একটি কাজ করেছেন। কিন্তু পাকিস্তান আইনের দৃষ্টিতে (সালমান তাসীর মালাউনের হত্যা) এটি জঘন্য অপরাধ। পাকিস্তান আদালতে রসূলের শানে অবমাননাকারী আসিয়া মালাউনের মুক্তির ফয়সালা হয়। এই ফায়সালার প্রথম বাক্যের লেখক থেকে নিয়ে সর্বশেষ বিচারক পর্যন্ত সকলেই ইসলামের দৃষ্টিতে যিন্দীক, মুলহীদ। যাদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে আসছে পাকিস্তানি আদালত।

৪. আমেরিকান ইহুদী সাংবাদিক 'ড্যানিয়েল পার্ল' (অনেকের মতে সে ছিল সি.আই.আই. এর স্টেশন চিফ) এর হত্যা বা উস্কানি দাতা হিসেবে আহমদ শায়খের উপর অপবাদ আরোপ করা হয়। আর সেই হত্যা মামলায় আহমদ উমর শায়খ উচ্চ আদালতের মাধ্যমে আইনিভাবে নির্দোষ প্রমাণিত হন।

৫. আহমদ ওমর শাইখের বিপরীতে আরেকটি হত্যা মামলা, যেটি করেছিলো 'রেমন্ড ডেভিস' নামের এক সন্ত্রাসী। সে দিনে দুপুরে পাকিস্তানের লাহোর শহরের মাজাংক চৌকিতে দুইজন অধিবাসীকে হত্যা করে। (কেউ কেউ বলেছেন, সে আই.এস.আই. এর সদস্য ছিল) 'রেমন্ড ডেভিস'এর সাহায্যে এগিয়ে আসা আমেরিকান সি.আই.আই. এর সদস্যরা উল্টো পথে গাড়ী চালাতে গিয়ে অন্য এক শহরের 'ইবাদুর রহমান' নামের এক ব্যক্তিকে গাড়ি চাপা দিয়ে শহীদ করে দিল। এই মামলায় 'রেমন্ড ডেভিস' আদালতে তার অপরাধের স্বীকারোক্তি দিয়েছে।

তাছাড়াও পশ্চিমা এবং আমেরিকান লেখকসহ অনেক সাংবাদিক বিষয়টি তাদের লেখায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। ব্রিটেনের 'দ্যা টেলিগ্রাফ' পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী 'রেমন্ড ডেভিস' পাকিস্তানে সি.আই.আই. এর স্থানীয় প্রতিনিধির স্টেশন চিফ ছিল।

উপরোক্ত দুটি ঘটনা থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় যে, পাকিস্তানি শাসন, আদালত প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে ইংরেজ ও পশ্চিমাদের গোলামী করছে (যাদের মাথা-মগজ সম্পূর্ণভাবে ইংরেজদের দ্বারা প্রভাবিত)। সব ধরণের বর্ণনা ও প্রমাণাদি থেকে আমেরিকা ও পাকিস্তান সর্বোচ্চ এতটুকু দাবি করেছে যে, আহমেদ ওমর শায়খ একজন মানুষকে হত্যা করে অথবা হত্যার উস্কানি দিয়েছে (মূলত এটি ছিল তাদের একটি ভুল ধারণা)। পক্ষান্তরে 'রেমন্ড ডেভিস' দুইজনকে হত্যা করেছে। স্বচক্ষে দেখা বিশ জন লোক যার সাক্ষী ছিলো। এতো কিছুর পরও 'রেমন্ড ডেভিস' এর ব্যাপারে শুধু পাকিস্তানের উচ্চ আদালত নয় বরং দায়রা জজ পর্যায়ের আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট মুক্তির ফয়সালা দিয়ে দিল। (এবং শরয়ী দিয়্যতের মত অর্থ আদায়ের ফয়সালা দিয়ে দিল)। তো এটা ছিল আমেরিকার আইনি চাহিদা পূরণ এবং তথাকথিত ইনসাফের বহিঃপ্রকাশ। আর উচ্চ আদালত দুই দশক ধরে জেলে অবস্থান করা নিরপরাধ আহমদ উমর শায়খের মুক্তির ফায়সালা করলে সেটি হয়ে যায় আইন ও ইনসাফ বহির্ভূত সিদ্ধান্ত!। ইয়া আসাফা (আফসোস)!

তাছাড়া আমেরিকান পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন, স্টেট ডিপার্টমেন্ট, আমেরিকার কংগ্রেস সরকার বিভিন্ন মাধ্যমে পাকিস্তানকে এই মামলায় আরও ইনসাফ করার প্রতি আদেশ করেছে। যার ভিত্তিতে পাকিস্তান সরকার নতুন করে আহমদ উমর শায়খের বিপক্ষে মামলার বিবাদী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

**এ ধরনের আরেকটি মামলা দেখুন:** আমেরিকার কারাগারে পাকিস্তানী মুসলিম নারী আমাদের বোন ড. আফিয়া সিদ্দিকী বন্দী আছেন। (আল্লাহ তায়ালা তাঁর মুক্তি তরান্বিত করুন) তাকে আমেরিকা ছিয়াশি বৎসরের কারাদণ্ড দিয়েছে। বর্তমান সরকার (ইমরান খান) ক্ষমতায় আসার পূর্বে আফিয়া সিদ্দিকীর মুক্তির বিষয়ে বিভিন্ন দাবী উপস্থাপন করেছিলো। কিন্তু সে বর্তমানে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে কমপক্ষে এতটুকু কি করতে পারবে যে, আমেরিকা সরকারকে একটি চিঠি লিখবে

এবং বলবে যে, আপনারা যেমন শায়খ আহমদ উমরের মামলাটি আমেরিকায় চালানোর প্রস্তাব করেছেন, আমরাও আফিয়া সিদ্দিকীর মামলা পাকিস্তানের উচ্চ আদালতে চালাতে চাই এবং এটি আমাদের অধিকারও, কেননা আফিয়া সিদ্দিকি পাকিস্তানের বাসিন্দা (তাঁর মামলায় আমাদের কথা বলার অধিকার আছে)?!

অথবা পাকিস্তান সরকার ও রাজনীতিবিদরা আমেরিকার কংগ্রেস সরকারকে আফিয়া সিদ্দিকির মামলার ক্ষেত্রে তাদের দাবি দাওয়া পেশ করুক। যেভাবে আমেরিকা ওয়াশিংটনে থাকা, পাকিস্তানি মুখপাত্রকে চিঠি লিখে আহমদ ওমর শাইখের মামলার বিষয়ে তাদের সংশয় অবহিত করেছে। এভাবে পাকিস্তানও ইসলামাবাদে অবস্থিত আমেরিকান মুখপাত্রের কাছে চিঠি লিখুক। না হয় আমাদের এটা বুঝার বাকি থাকবে না যে, তথাকথিত ইনসাফ সেটাই যা আমেরিকানরা চায়!।

## নারী দিবসের মিছিলের বিপরীতে হায়া তথা লজ্জা দিবসের মিছিলের আয়োজন একটি হাস্যকর বিষয়:

যে সাধুরা মনে করেন যে, লজ্জা মিছিলের পক্ষে শ্লোগান দিলে নারী দিবসের মিছিলগুলো নিয়ন্ত্রিত হয়ে যাবে তারা একেবারে নির্বোধ। যদি একদিকে কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে থাকে আর অপর দিকে আপনি অন্য কোন ভালো কথা, উচ্চ মানের কথা তথা তাকবীর, তাহলীল, উচ্চস্বরে বলতে শুরু করেন, তাতে কুকুর নিজে নিজে চলে যাবে না। এমনকি কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দও থামবে না।

মক্কা বিজয় হয়েছে, কিন্তু এখনো রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের জন্য আগমন করেননি, কারণ এতদিন পর্যন্ত কাবার চতুঃপার্শ্বে উলঙ্গ তওয়াফ করা হতো, ঢাক-ঢোল বাজানো হতো এবং মুশরিকরাও হজ্জ করতো। ঐ বছর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. কে হজ্জের আমীর নিযুক্ত করলেন এবং হযরত আলী রা. এর মাধ্যমে ঘোষণা করালেন যে, এ বছরের পর থেকে হজ্জের সময় সকল অপসংস্কৃতি নিষিদ্ধ করা হল এবং মুশরিকরা আগামী বছর থেকে আর হজ্জে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পদ্ধতি অবলম্বন করেননি যে, অধিক মানুষ ইহরাম পরে নিজেদের সতর ঢাকার মাধ্যমে কম উলঙ্গ লোকের বেহায়াপনাকে

পরিবর্তন করে বিজয়ী হবেন এবং "লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক" এর সুউচ্চ আওয়াজ বাজনার আওয়াজকে স্তমিত করে দিবে (মুসলিমদের আধিক্যতা ও প্রভাবের কারণে যেটি বাহ্যিকভাবে সম্ভব ছিল। কারণ হজ্জে উলঙ্গ লোকের সংখ্যা সতর ঢাকা লোকের হিসেবে আটার মাঝে লবণের পরিমাণ ছিল)। বরং 'নাহি আনিল মুনকার' তথা অসৎকাজ হতে বারণের মাধ্যমে এই মহান লক্ষ্য অর্জিত হয়। যদি সমস্ত সৃষ্টি জীবের ঈমান একদিকে আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঈমান অন্যদিকে রাখা হয়, তাহলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঈমান অবশ্যই উচ্চ মর্যাদার ও ভারী হবে। এই ঈমানের সামনে প্রতিটি বস্তুই পরাজিত। তা সত্ত্বেও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ বছর হজ্জে না গিয়ে তার পরের বৎসর গিয়েছেন।

যদি লজ্জা মিছিল এর এই আন্দোলন ফলদায়ক করতে হয়, তাহলে কমপক্ষে গোঁড়া থেকে এই ফাসাদের খোঁজখবর নিতে হবে এবং তা বন্ধ করতে হবে সেখান থেকেই। দ্বীনের অকাট্য বিধানকে পিছনে ফেলে কোন সফলতাই অর্জন করা সম্ভব নয়। একজন মরহুম আল্লাহওয়ালা, যিনি যুবক বয়সে ছাত্র রাজনীতি করতেন, (পঞ্চাশ-ষাট বছর পূর্বে)। কয়েক বছর পূর্বে তাকে ডানপন্থী-বামপন্থী রাজনীতি বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন; এখন তো ডানপন্থীদের বিজয়ের সময়। এখন দ্বীন বিজয়ের সময়!।

দ্বীন এসেছে বিজয়ী হওয়ার জন্য, কুফরের সাথে সমঝোতা করে চলার জন্য নয়। এক মন দুধের মাঝে এক ফোটা পেশাব মিশ্রণ করলে পুরোটাই নাপাক হয়ে যাবে। (তেমনি ইসলামি রাজনীতির সাথে কুফরের মিশ্রণ গ্রহণযোগ্য নয়)।

## আমেরিকার নৌবহর ডুবে যাচ্ছে!

প্রতিটি জিনিসের ধ্বংসের কিছু নিদর্শন রয়েছে, কিছু ছোট নিদর্শন আর কিছু বড় নিদর্শন। আর আমেরিকার নৌবহর ডুবে যাচ্ছে, এটার বহু নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে। জো বাইডেন যখন এই নৌবহরের মাঝি হলেন তখন তার সাথে সাথে কিছু বিপদও আমেরিকার ঘাড়ে চেপে বসলো। মহিলাদের শাসক হওয়া ইসলাম সমর্থন করে না। ইরানের বাদশাহর যখন মৃত্যু হল তখন লোকেরা তার মেয়েকে

শাসক বানিয়ে দিলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই খবর পেয়ে বলেছেন:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً

অর্থ: ঐ সম্প্রদায় কখনো সফল হতে পারবে না যারা নিজেদের নেতৃত্ব কোন মহিলার নিকট হস্তান্তর করে। (সহিহ বুখারী-৭০৯৯)

এক তো হল আমেরিকার ইতিহাসে প্রথমবার একজন নারী উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হল, তারপর বাইডেনের সময়ে অর্থমন্ত্রী নির্বাচিত হল একজন মহিলা। বাজেট দপ্তরেরও প্রধান নির্বাচিত হয় একজন নারী। এই পদক্ষেপগুলো তাদের অধঃপতনের জন্য যথেষ্ট ছিল। সরকার গঠনের চতুর্থ, পঞ্চম দিনই জো বাইডেন আদেশ জারি করল যে, আমেরিকান সৈন্যে হিজড়াদের অন্তর্ভুক্ত করণ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হল (এখন থেকে হিজড়ারাও আমেরিকান সেনাবাহীনিতে যোগ দিতে পারবে)।

## আমেরিকার নেতৃত্ব; ট্রাম্প ও জো বাইডেন অভিন্ন ব্যক্তি:

আমেরিকার ক্ষমতায় ট্রাম্প হোক বা জো বাইডেন, ধোঁকাবাজ ডেমোক্রেটিক দল আসুক বা উগ্রপন্থী রিপাবলিকান দল, আমেরিকা সব সময় ইহুদীদের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে যায়। ইংরেজদের অবৈধ সন্তান ইজরাইলদের পক্ষে ইতিপূর্বে যদিও হোয়াইট হাউসে শুধু 'জারেড কুশনার' এর মত একজন ইহুদী ছিল। তবে বর্তমানে আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ' অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ' নিজেই একজন ইয়াহুদী।

## অংসান সুচি:

সাম্রাজ্যবাদ রাষ্ট্রের পালিত একজন সৈনিক 'মেজর জেনারেল অংসান' এর মেয়ে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী বৃদ্ধা ডাইনি 'সুচি', যে বহু মুসলিমের হত্যাকারী। গত কয়েক সপ্তাহ পূর্বে বার্মা সেনাবাহিনী 'অংসান সুচি'কে তার গণতান্ত্রিক ক্ষমতা থেকে পদচ্যুত করে এবং তাকে নজরবন্দী করে।

**রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি হাদিসের সারাংশ:** তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোন জালেমের সাহায্য করে, আল্লাহ তায়ালা ঐ জালিমকেই তার উপর চাপিয়ে দেন।" 'সুচি' মুসলমানদের সাথে এ পরিমাণ শত্রুতা পোষণ করে যে, কয়েক বছর পূর্বে বিবিসিতে একটি সাক্ষাৎকার দেয়ার প্রাক্কালে সে যখন জানতে পারলো যে, তার সাক্ষাতকার নিতে আসা সাংবাদিক মহিলাটি 'মিশেল হুসাইন' নামের একজন মুসলিম, তখন সে সাথে সাথে সাক্ষাৎকার দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এই সুচির অত্যাচারের ভয়েই বার্মার সৈন্য এবং তার বস্তুবাদী যোগী ধর্মাবলম্বীরা ইসলামের শত্রুতায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে। আজ সেই সৈন্যদেরকেই তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইতিহাস এভাবে ফিরে আসে।

সুচিকে নজরবন্দী ও ক্ষমতাচ্যুত করে সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ নেয়ার পর আমেরিকা ও পশ্চিমা শক্তিগুলো হইচই শুরু করেছে এবং এই বলে মূর্ছা যাচ্ছে যে, সেনাবাহিনীর এধরনের পদক্ষেপ গণতন্ত্রকে পদদলিত করছে। বাস্তবেই গণতন্ত্রের প্রতি পশ্চিমা শক্তিদের এতটুকু ভরসা ও ভালোবাসা নেই যতটুকু তারা প্রকাশ করে ও বলে বেড়ায়। বরং তাদের ভালোবাসা শুধু নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য। সামরিক শাসক 'হুসনি মুবারক' যখন (সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে) আমেরিকার স্বার্থ রক্ষায় কাজ করেছে তখন অংসান সুচি ও তথাকথিত গণতন্ত্রের পক্ষাবলম্বনকারী বারাক ওবামাও তার কথার সুর পরিবর্তন করে বলে যে, কিছু লোক এমনও আছে যারা গণতন্ত্র ছাড়াও ভালো কাজ করে।

আরেকটি উদাহরণ হল, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে পরিবর্তনকারী 'সিসি'র মত সামরিক সরকারকে আমেরিকা ও পশ্চিমা শক্তিগুলো সমর্থন ও রক্ষণাবেক্ষণ করেছে। তেমনি সৌদি আরবেও গণতন্ত্রের বিপরীতে রাজতন্ত্র রয়েছে। পাকিস্তানে আইয়ুব খান হতে পারভেজ মোশাররফ পর্যন্ত দীর্ঘ এই সময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ছিল। তবুও আমেরিকা তাদের পক্ষাবলম্বন করেছে, কেননা তারা আমেরিকার স্বার্থে ব্যবহারিত হয়েছে।

কাজেই মূল কথা হল বার্মার সুচি যেহেতু তার দেশে আমেরিকার মেরুদণ্ড ছিল আর সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখলের পিছনে চীনের হস্তক্ষেপ ছিল (তাই আমেরিকা সুচিকে রক্ষা করতে তথাকথিত গণতন্ত্রের বুলি আওড়াচ্ছে)। একটি প্রবাদবাক্য আছে; আমাদের কুত্তা কুত্তা, আর তোমাদের কুত্তা টমি।

## ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি থেকে গ্লো অ্যান্ড লাভলী

চাল-চরিত্রের মূল মাপকাঠি হল মানুষের উত্তম আখলাক। বাহ্যিক আকৃতির সৌন্দর্য্যতা হল অস্থায়ী বিষয়। বাস্তবতা হল দুনিয়ায় মাপকাঠিতেও সুন্দর এবং সুন্দর পূজারীদের কোন স্থায়িত্ব নেই। সৌন্দর্য্য ও ভালোবাসা প্রকাশের স্থান দুনিয়া নয়, জান্নাত।

'হামেদা' (একজন নারী) যখন নিজ ঘরের বাতি ছিল তখন ঘর ও ঘরের অধিবাসীরা তার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল। হামেদাও ছিল খুশি। কিন্তু যখন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তাকে ঘর হতে বের করে আনল এবং তাকে সংস্থার লিডার বানানো হল আর জানিয়ে দিলো যে, এই উদারতার বিনিময়ে সৌন্দর্য্য বিসর্জন দিতে হবে। এমনকি দৈহিক সৌন্দর্য্য একটি স্বতন্ত্র পেশার নামে আত্মপ্রকাশ করলো। তখন প্লাস্টিক সার্জারি আসল। সৌন্দর্য্য পেশা বিভিন্ন রঙ্গের নামে আত্মপ্রকাশ করলো। হিন্দুস্তানি ইউনিলিভার সেমিটেক্স গার্মেন্টসের শত শত লোককে অন্য আরেকটি ফেয়ার অ্যান্ড লাভলির পরিচয় করালো। আমাদের এলাকার অধিকাংশের রং গৌরী বর্ণের নয়, বাদামী ও সোনালী রঙ্গের। আর যেহেতু সৌন্দর্যের বাজারের চিন্তা-চেতনার আমদানীকারী পশ্চিমারা, তাই তাদের অনুসরণে আমাদের এখানেও রঙ্গের মাপকাঠি হল সাদা। পশ্চিমা সৌন্দর্য্য নীতিতেও প্রক্রিয়াজাত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। অর্থাৎ সেখানে নারীদের শরীরে বাদামী ও সোনালী রঙ তৈরি করতে তাদের চামড়াকে শোধন করা হতো।

ফ্যামিনিজমের উত্থানের মাধ্যমে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও নারী স্বাধীনতার মতো মতবাদ আরও দৃঢ়তা লাভ করলো। এর প্রবক্তা আরো দৃঢ়তার সাথেই নারী স্বাধীনতার কথাগুলো বলতে লাগলো। কারো মতে শক্তিশালী দৈহিক গঠন বিশিষ্ট মহিলারা ঘর ভাঙ্গার জন্যই বের হয়ে যাচ্ছে। এখন শুধু চিন্তায় এ কথা রয়েছে যে, পুরুষের দরকার বটে সম্পদের নয়। মহিলারা গাড়ির সহযোগী চাকা। সুতরাং তাতে মহিলারা পুরুষের মত কোথাও কালো, কোথাও গৌর বর্ণের। ফ্যামেনিজম (ফেয়ার এন্ড লাভলি) গৌরী ও সৌন্দর্যের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করলো। সাথে সাথে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাও নিজেদের পণ্য (ব্রান্ড) পরিবর্তন করে ফেললো। এখন প্রয়োজনীয় উজ্জ্বল ও সৌন্দর্য্য (গ্লো অ্যান্ড লাভলী) নাম হয়ে গেলো।

সামগ্রিকভাবে বাদামী রঙ্গের জন্য যদি গুড়ের মধ্যে গোসল করা একটা মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে চীনে যেমন শরীর তাজা দেখাতে ক্রিম পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি কিছুদিন পর গুড়ের 'আবে হায়াত' (তথা বাদামী রঙ্গের জন্য গুড়ের যে পানিতে গোসল করা হয় 'আবে হায়াত' বলে সেটাই বুঝানো হয়েছে) ও বিক্রি হওয়া শুরু হবে। যেমন আমেরিকায় চড়ামুল্যে ঘাসের সরবত ও ঘাসের দুধও বিক্রি হয়।

সৌন্দর্য্য বর্ধিত করণ এবং দেখতে ভালো লাগে এমন বিষয়কে দেখা মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। কিন্তু গৌর বর্ণকে কালো বা কালো বর্ণকে গৌরী বর্ণে পরিণত করা অনধিকার চর্চা। যেকোনো ধরণের অনধিকার চর্চাই খারাপ জিনিস। ঘরের সৌন্দর্য্য ঘরেই মানায় ও ভালো লাগে। অন্তর যতই দামি ও গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, কেউ সেটিকে সিনা হতে বের করে মাথায় লাগাতে চাইবে না।

**গোলামের ছেলে গোলাম!**

সৌদি আরব গত ২৯ই এপ্রিল একটি বিবৃতিতে বলেছে যে, তারা ইরানের সাথে শান্তি ও নিরাপত্তা চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চায়। গোলামের তো কোন ধর্ম হতে পারে না। না কোন তরিকা, না কোন মতামত আর না কোন অবস্থান। গোলামের কাজ তো শুধু মনিবের অনুসরণে ঐ সকল কাজ করা ও তোতাপাখির মত কথা দোহরানো, যা মনিবের কাছ থেকে প্রকাশ পায়। সৌদি আরব ছয়-সাত বছর পর্যন্ত ইরান ও তার জোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলো এবং কোটি কোটি ডলারের বিনিময়ে নতুন জোট গঠন করলো। ইয়েমেন, যেখানে ইরানীরা কাসেম সোলাইমানীর মাধ্যমে হুতিদের নানা দিকে সাহায্য করলো। (বস্তুত আমেরিকার স্বার্থই সৌদির স্বার্থ ছিলো)। হুতিরা মিসাইল ও বারুদ বিহীন ড্রোন তৈরি করলো। যা দিয়ে সৌদি আরবের তেল উত্তোলন কেন্দ্রে আঘাত হানলে সৌদির অর্ধেক তেল উত্তোলন কিছু দিনের জন্য বন্ধ ছিল। যার কারণে তেলের বিশ্ববাজারে ভূমিকম্প আসলো। এর পূর্বে সৌদি আরব ইরান জোটের সাথে সমঝোতা বন্ধ করার চেষ্টা করলো। সৌদি আরবের মূল মনিব ছিল প্রভাবশালী আমেরিকা। আমেরিকায় ইরানের সবচেয়ে বিরোধী ট্রাম্পেরও বিদায় হল। মোনাফেক জো বাইডেন নির্বাচিত হল। ওবামার সকল চুক্তি আবার সচল করার কথা হল। এমনকি সন্ধিচুক্তি শুরু হল। এভাবে

গোলামের ছেলে গোলাম অর্থাৎ মুহাম্মদ বিন সালমান ইবনে আব্দুল আজিজের সরকার ঘোষণা দিল যে, ইরানের সাথে শান্তি চুক্তি চাই। এবার বুঝুন এই সন্ধি প্রস্তাবের মুল হোতা কারা।

ক্ষমতায় আসার পর পরই নিকৃষ্ট জীবন যাপনকারীদের এক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। তাদের নিকৃষ্ট রাজনীতি আলাদা ছিল। শতাব্দীর নিকৃষ্ট মহামারির মোকাবেলা করতে হল। অন্য দিকে এত অল্প সময়ে আমাদের দেশে যেভাবে জীবন যাপন উন্নতির দিকে এগিয়ে গেলো পূর্বে তার কোন দৃষ্টান্ত নেই।

"বুঝলে জানতে পারবে, আমরা যে তোমাদেরকে মান্য করি" এটি কার কথা? এটি হল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এর কথা। আপনি মনে করেছেন এটি ইমরান খানের কথা?

# তাওহীদের সফর

**শহীদ শাইখ আবু বাসীর নাসের আল উহাইশী রহিমাহুল্লাহু**

(শহীদ শাইখ আবু বাসীর নাসের আল উহাইশী ছিলেন আল-কায়দার জেনারেল নায়েবে আমীর, আল-কায়দা জাজীরাতুল আরব এর আমীর এবং শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহু এর একান্ত সহচরদের অন্যতম। তিনি নিম্নোক্ত আলোচনাটি করেছিলেন মুজাহিদগণের একটি মজলিসে। তিনি ছিলেন বামিয়ানের বৌদ্ধমূর্তি ধ্বংসের একজন প্রত্যক্ষদর্শী। তৃতীয় উমর খ্যাত, মূর্তি বিনাশকারী, আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ উমরের নির্দেশক্রমে ২০০১ সালের মার্চ মাসে যিনি মূর্তি ধ্বংস করেছিলেন। - **সম্পাদক**)

তখন গোটা বিশ্বের দৃষ্টি আফগানিস্তানের দিকে নিবদ্ধ ছিল। বিশেষত: যখন তালেবান আন্দোলন বৌদ্ধমূর্তি ধ্বংসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আপনারা জানেন, ঐ সকল মূর্তি ধ্বংসের কারণে গোটা বিশ্বে কি পরিমাণ চিৎকার-চেঁচামেচি, ইখতেলাফ-মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়েছিল এবং কুফরি বিশ্ব তার ধ্বংসের কারণে কতই না তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছিল। মূল ঘটনাটি হল-তালিবান মুজাহিদগণের আন্দোলন যখন এক পর্যায়ে বামিয়ান উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছল তখন তাঁরা এই বৌদ্ধমূর্তিগুলো দেখলেন। সেগুলো দেখামাত্রই তালিবানরা তা ধ্বংস করার জন্য ট্যাংকের গোলা বর্ষণ শুরু করে দিলেন। কিন্তু মূর্তিগুলো ছিল অনেক লম্বা আকৃতি বিশিষ্ট। সে ব্যাপারে গোটা বিশ্বে অনেক চিৎকার-চেঁচামেচি হল, কিছু কিছু ফতোয়াও প্রকাশ পেল, কতক মুসলিম উলামা এই মাসয়ালার জন্য সমবেত হল এবং বিভিন্ন দেশ থেকে তা ক্রয়ের জন্য তালিবানদের কাছে উপহার-উপঢৌকন পেশ করা হল। যখন এই সব উপহার সামগ্রী আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ উমর পর্যন্ত পৌঁছল তিনি এক ঐতিহাসিক শব্দমালা উচ্চারণ করেছিলেন: "কিয়ামতের দিন মূর্তি বিক্রেতার পরিবর্তে মূর্তি ধ্বংসকারী নামে আমাকে উঠানো হবে এটাই আমার নিকট পছন্দনীয়!"

চীন, জাপান এবং অন্যান্য বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের পক্ষ থেকে বড় বড় উপহার-উপঢৌকন আসলো। তারা বলল: আমরা এসব মূর্তি টুকরা টুকরা করে এখান থেকে স্থানান্তর করে নিব এবং এর জন্য তারা তালিবানদেরকে অনেক অর্থ-কড়ির প্রস্তাব করলো। কিন্তু আমীরুল মুমিনীন এসব উপহার-উপঢৌকনের প্রস্তাব

প্রত্যাখ্যান করে বললেন: "আমরা তো ঐ ইবাদতের পূর্ণতা দিব যা তোমাদের মত কাফেরদেরকে অসন্তুষ্ট করবে।"

অবশেষে তা ধ্বংসের সকল প্রস্তুতি শুরু হল। তখন শাইখ উসামা বিন লাদেনও বামিয়ানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। আমরা আমাদের সাথে গাড়ি, বুল-ডোজার এবং মাটি খননকারী যন্ত্রাদি সফরে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করলাম। কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা ছিল? বামিয়ানে যাওয়ার! আল-কায়দার সকলেই বামিয়ানে রওনা হয়ে গিয়েছিল।

আমরা সেদিন রাত এগারোটা পর্যন্ত সকল আসবাবপত্র প্রস্তুত করলাম, যাতে ভোর বেলায় রওনা করতে পারি। ভোরে যখন আমরা জাগ্রত হলাম তখন জানতে পারলাম শাইখ উসামা আমাদের পূর্বেই রওনা হয়ে গিয়েছেন। আমি আব্দুল মজিদ ফাক্কাল্লাহু আসরাহ এবং আমার শশুর আসেম এর সাথে বামিয়ানের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। পথিমধ্যে গজনীর নিকটে আমি শাইখ উসামার গাড়ি দেখতে পেলাম। আমি আমার সফরসঙ্গীদেরকে বললাম: এটা তো শাইখ উসামার গাড়ি। তারা বললেন: অসম্ভব! শাইখ তো এখন বামিয়ানে থাকার কথা। কিন্তু যখন শাইখের গাড়ি আমাদের গাড়ির কাছাকাছি হলে তখন আমরা বাস্তবেই দেখতে পেলাম শাইখ গাড়িতে অবস্থান করছেন। খালেদ শায়খ মুহাম্মদ ফাক্কাল্লাহু আসরাহ গাড়ি ড্রাইভিং করছিলেন। খালেদ সবসময় শাইখের সাথে অবস্থান করতেন। তিনি অনেক কর্মঠ-উদ্যমী ব্যক্তি ছিলেন। আল্লাহ তাকে মুক্তি দান করুন। আমি তাকে গাড়ির দরজার নিকট দাঁড়ানো দেখতে পেলাম। তাকে জিজ্ঞাস করলাম: গাড়িতে আমার বসার সুযোগ হবে কি? তিনি বললেন: না। অত:পর তিনি আমাকে জানালেন, গাড়িতে শাইখ উসামা, শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহু, শাইখ আবু ওয়ালীদ আল-আনসারী ফাক্কাল্লাহু আসরাহ এবং শাইখ ঈসা রহিমাহুল্লাহু অবস্থান করছেন। আমরা অনেক পেরেশান হলাম এবং জিজ্ঞাস করলাম: আপনারা এখানে এত বিলম্বে কেন পৌঁছলেন? আপনাদের এখন বামিয়ানে থাকার কথা। আমি এই ব্যাপারে শাইখ উসামাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: ইউসুফ কারযাভী কান্দাহার এসেছেন। কান্দাহারের এক মেহমানখানায় তাঁর সাথে মুহাম্মদ আম্মারা, তানতাভী, নসর ফরীদ এর মত বাহরাইন এবং কাতারের বড় বড় স্কলার ও দাঈগণ এসেছেন। এই প্রতিনিধিদল তালিবানদেরকে লা-জওয়াব করতে এসেছেন এবং তারা তালিবানদের সাথে এই বিষয়ে মুনাজারা

করতে চাচ্ছেন যে, তারা মূর্তিগুলো ধ্বংস করবে না। এই জন্য আমাদের সাথীরাও সেখানে গিয়েছেন। শাইখ আবু হাফস এবং শাইখ সুলাইমান আবু গাইসও সেখানে আছেন। তালিবানদের উলামায়ে কেরামও উপস্থিত ছিলেন। শাইখ বললেন: তাই আমরাও ঐ মজলিসে অংশগ্রহণ করলাম। আমাদের ইচ্ছা ছিল, ঐ মজলিসের একটি ভিডিও বানানো হোক; কিন্তু তালিবানরা অনুমতি দেননি। তারা বলল: অডিও রেকর্ডারের মাধ্যমে রেকর্ড করে নিতেন। উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এটাই যথেষ্ট। তালিবান উলামায়ে কেরাম উক্ত প্রতিনিধিদলের সাথে আলোচনা করলেন। তাঁদের আলোচনার শেষে (মুজাহিদ) আরব উলামাগণ আলোচনা করলেন। তাঁরা প্রতিনিধিদলকে বললেন: মৌলিকভাবে এটাই মিল্লাতে ইবরাহীম এবং এই মূর্তিগুলোকে ভাঙ্গার ব্যাপারে অন্য কোন ব্যক্তি আপনাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারে না।

জওয়াবে প্রতিনিধিদল বললেন: না! আমরা মূর্তি ভাঙ্গার বিষয়ে কোন কথা বলবো না। বরং বলতে চাচ্ছি, এখন মূর্তি ভাঙ্গার উপযুক্ত সময় নয়।

শাইখ আবু হাফস মিসরি রহিমাহুল্লাহু বললেন: তালিবান, তাঁদের উলামায়ে কেরাম এবং আফগান জনসাধারণ বলেছেন, আমরা ঐ সব মূর্তি ভাঙ্গার পূর্ণ প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেছি। সুতরাং তারা যখন প্রস্তুত এবং আল্লাহ তায়ালার উপর পূর্ণ আস্থা রেখে তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে (আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন।) তাহলে আমরা কেন তাদেরকে এই মূর্তি ভাঙ্গার ব্যাপারে বাধা প্রদান করবো?

মোটকথা, আলোচনা-পর্যালোচনা অনেক দীর্ঘায়িত হল। কিন্তু অবশেষে মূর্তি ভেঙ্গে ফেলার সিদ্ধান্ত হল। আলোচনার মজলিস সমাপ্তি হল। সকলেই বাহিরে চলে গেলেন এবং প্রতিনিধিদলও নিরাশ হয়ে ফিরে গেলেন। আমরা সকলেই এই সভা শেষে মূর্তি ভাঙ্গায় অংশগ্রহণ করার জন্য পুনরায় বামিয়ান অভিমুখে রওনা হলাম। এই কারণেই আমরা এই সফরের নামকরণ করেছিলাম "তাওহীদের সফর"।

# কাশ্মীরের জিহাদে আমার অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণ

শহীদ আদেল আহমাদ লোন রহিমাহুল্লাহ

(শহীদ ভাই আদেল আহমাদ লোন, দীর্ঘ সময় ধরে 'হয়তো শরীয়ত নয়তো শাহাদাত' কাফেলার সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি "নাওয়ায়ে গাজওয়ায়ে হিন্দ" পত্রিকার বিষয়বস্তুর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে আসছিলেন, তাঁর লিখিত নাম ছিল, ইকরিমা শোপিয়ানী। ১০ ই এপ্রিল ২০২১ ইং তারিখে উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসী দলের সাথে এক যুদ্ধে তিনি শাহাদাতের মাধ্যমে এ পৃথিবী থেকে পৃথক হয়ে গেছেন। এপ্রিলের ১০ তারিখেই কাশ্মীর উপত্যকায় দুটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 'হয়তো শরীয়ত নয়তো শাহাদাত' কাফেলার সাথে সংযুক্ত সাতজন সাথী শহীদ হয়েছেন। (যাদের মধ্যে একজন ছিলেন ইকরিমা ভাই) অন্যান্য শহীদগণ হলেন, দারুল উলুম দেওবন্দের ছাত্র ভাই হাফেজ মুজ্জাম্মিল মনযুর তানতেরে (যাকে মুজাহিদদের মাঝে মোল্লা হাফেজ মুহাম্মাদ মকবুল এবং মুহাম্মাদ মোস্তফা আব্দুল কারীম নামে ডাকা হতো) ইমতিয়াজ আহমদ শাহ, বাসেত ইসমাঈল বখশী, যাহেদ আহমদ কোঁকা, ইউনুস আহমদ খান্ডে এবং কাশেফ বশীর মীর রহিমাহুমুল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদের ঐ সকল শহীদ সাথীদের রক্তের বিনিময়ে কাশ্মীরের জিহাদকে কবুল করে নিন। এবং 'হয়তো শরীয়ত নয়তো শাহাদাত' এর মিশনকে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা দান করুন। এই মিশন যা প্রত্যেক মুমিনের মাকসাদ, অর্থাৎ হয়তো আল্লাহ তাআলার শরীয়ত আমাদের জীবনে বিজয়, হবে অথবা শাহাদাতের রক্ত দ্বারা জিহাদের গাছকে প্রবাহিত করে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাব। **- সম্পাদক**)

জিহাদ ইসলামের ফরজ বিধানসমূহের মধ্যে হতে একটি, এবং আল্লাহ তাআলার নাম এবং আইনকে সুউচ্চ এবং বিজয়ী করার মাধ্যম। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের ইজ্জত জিহাদের আমলের সাথে শর্তযুক্ত করে দিয়েছেন। আর জিহাদ পরিত্যগকারীর ব্যাপারে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এবং অপদস্থতা আরোপ করে দেওয়ার ধমকি দিয়েছেন। জিহাদের মাধ্যমেই আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়, কুফর এবং ফ্যাসাদ নিঃশেষ করা যায়। জিহাদ আল্লাহ তাআলার হুকুম, জিহাদ আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে ফরজ বিধান এবং দ্বীনের হেফাজতের মাধ্যম। এই বিশ্বাস এবং আকিদা রাখা আমাদের উপর ফরজ। যে

ব্যক্তি এই বিশ্বাস এবং আকিদা না রাখবে, ইসলামের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। কেননা উলামায়ে কেরাম বলেন, যে কুরআনের অর্ধ আয়াতও অস্বীকার করবে অথবা একটি হরফও অস্বীকার করবে, সে ব্যক্তি মুসলিম থাকবে না। সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআন মাজিদের প্রায় সাড়ে চারশত আয়াত, যে আয়াতগুলোতে জিহাদের আলোচনা রয়েছে, এগুলো অস্বীকার করবে, তারপরও সে কিভাবে মুসলিম থাকতে পারে?

আল্লাহ পাক এ দ্বীনের হেফাজতের জন্য এবং দ্বীনকে পুরো বিশ্বের উপর বিজয়ী করার জন্য যেই ফরজ বিধান এবং হুকুম অবতীর্ণ করেছেন, তা হলে জিহাদ। এ জিহাদের ব্যাপারে উম্মতে মুসলিমাহর উপর আবশ্যক হলো, জিহাদকে এভাবে বিশ্বাস করবে যে, জিহাদ আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে একটি ফরজ বিধান। এবং এ জিহাদে বের হয়ে নিজ জান-মালকে আল্লাহ তাআলার রাহে কুরবানি করবে। হাদিসে পাকের ভাবার্থ এরকম, মুজাহিদের জন্য জিহাদের ময়দানে এক মুহূর্ত অবস্থান করা একজন আবেদের সত্তর বছর রিয়ামুক্ত ইবাদত থেকে উত্তম।

জিহাদে আসার পূর্বে আমি এটা চিন্তা করতাম যে, আমি জিহাদে অংশগ্রহণ করে নিব, আমার বন্দুক থাকবে এবং কাফেরদের সাথে যুদ্ধ হবে। এমন-অনেক বিষয় আমার অজানা ছিল, যা জিহাদে অত্যন্ত জরুরী এবং জিহাদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপে এগুলোর মুখোমুখি হতে হয়। এবং এগুলোর প্রতি খেয়াল রাখাও সীমাহীন প্রয়োজন পরে। তারপর আস্তে আস্তে আমি আলহামদুলিল্লাহ এমন অনেক জিনিস শিখে নিয়েছি এবং এগুলোর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। এগুলো হলো, সে সকল জিনিস, যা প্রত্যেক মুজাহিদকে মুখোমুখি হতে হয়। এবং যে ব্যক্তিই জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চায়, তার জন্য নিজ ঘর থেকেই এসকল বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা চাই। জিহাদে অংশগ্রহণের পর আমার চোখ খুলে গিয়েছিল। যারা জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত নয় তাদের অধিকাংশই এ বিষয়ে গাফেল এবং ভুল বুঝের উপর থাকে যে, জিহাদে ইলমের প্রয়োজন পরে না। কিন্তু এখানে এসে আমার বুঝে এসেছে যে, একজন মুজাহিদের জন্য ইলমের প্রয়োজন কি পরিমাণ হয়ে থাকে!

আল্লাহ তাআলা যাকে ইলম দান করেছেন, সে অনেক সৌভাগ্যবান, আর ইলম বলা হয়, যার উপর আমল করা হয়। আর বাস্তবেও আমরা দেখি, যেসকল

হযরতগণ নিজ ইলমের উপর আমল করেন না, তারা জিহাদ এবং অন্যান্য নেক আমল থেকে দূরে সড়ে যান। হাদিসের ভাবার্থ এরূপ, একজন আলেম এবং একজন মূর্খ ব্যক্তি বরাবর হতে পারেনা। ইলমের মাধ্যমে মানুষ হক এবং বাতিলের মাঝে পার্থক্য করতে পারে। যখন একজন মুজাহিদের নিকট ইলম থাকবে, তখনই হক্ব-বাতিলের মাঝে পার্থক্য করতে পারবে। হযরত শাইখ আবদুল্লাহ আযাযাম শহীদ রহিমাহুল্লাহর উক্তি, "যে মুজাহিদ ইলম এবং তাকওয়া ব্যতীত হাতিয়ার উত্তোলন করে, সে লুটেরা হয়ে যায়"। একজন মুজাহিদের জন্য প্রতি কদমে কদমে ইলমের প্রয়োজন হয়। যখন তার নিকট শরীয়তের ইলম থাকবে, তখনই সে তার জীবনে আগত বিভিন্ন মাসায়েলকে শরীয়তের আলোকে সমাধান করতে পারবে। যদিও সে এমন কোন পদে উন্নীত না হয়, যার থেকে মাসায়েলের সমাধান করা এবং ফায়সালা করার প্রয়োজন পরে। তারপরও সর্বাবস্থায় তার জীবনে আগত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য উলামায়ে কেরামের নিকট প্রশ্ন করে নিতে হবেই। কারণ প্রশ্ন করার মাঝেই অর্ধেক ইলম, যদি সে ইলম ব্যতীত ফায়সালা করে, তাহলে তা ধ্বংসের কারণ হবে। অনেক মুজাহিদ একথাও বলেন যে, আমরা ময়দানের আমলে রয়েছি, আমাদের ইলম শিক্ষার কি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আমি তাদেরকে বলতে চাই যে, সাহাবায়ে কেয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন মুজাহিদ ছিলেন না? তাঁরা কি জিহাদের ময়দানেও ইলম অর্জন করেছিলেন না?

বাইতুল মাকদিস বিজয় করার মাসআলা ছিল, মুসলিমগণ সেখানে আক্রমণ করলেন, সেখানকার লোকেরা বলল, আপনারা আপনাদের খলিফাকে আমাদের নিকট প্রেরণ করুন। আমাদের নিকট তাঁর নিদর্শন রয়েছে, আমরা তাকে দেখব, যদি তাঁর মাঝে নিদর্শনগুলো পেয়ে যাই, তাহলে কোন লড়াই ছাড়াই আমরা চাবিগুলো তাঁর হাতে দিয়ে দিব।

হযরত উমর রাযিআল্লাহ আনহুর বাহ্যিক অবস্থা ছিল যে, তিনি গায়ের জামার উপর চামড়ার তালি লাগানো ছিল। আর ন্যায়-পরায়ণতার অবস্থা ছিল, যখন তাঁর সফরে গোলাম সাথে ছিল, তখন কিছু পথ নিজে বাহনের উপর বসতেন আর গোলাম পায়ে হেটে চলত। আর কিছু পথ তিনি নিজে পায়ে হেটে চলতেন আর গোলাম বাহনের উপর থাকত। আর এভাবে যখন চলতে চলতে বাইতুল মাকদিসের নিকটবর্তী এলাকায় চলে আসলেন, যখন হযরত উমর রাযিআল্লাহ আনহুর পালা ছিল, পায়ে হেটে চলা। আর গোলামের পালা ছিল, বাহনের উপর

বসে চলা। মুসলিমদের খলিফা এ অবস্থায় শত্রুদের নিকট যাচ্ছে যে, তিনি উটের রশি ধরে আছেন, কাপড়ে তালি লাগানো আর গোলাম উটের উপর বসে আছে। বাইতুল মাকদিসের অধিবাসীরা বলতে লাগল তিনিই সে ব্যক্তি যার নিদর্শনগুলো কিতাবসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। এই বলে তারা বাইতুল মাকদিসের চাবিসমূহ তাঁর হাতে দিয়ে দিল।

এ সম্মান কিভাবে অর্জিত হয়েছে? শুধু ঈমানী শক্তির মাধ্যমে, যা মানুষের ইলম, আমল এবং ইখলাসের কারণে নসীব হয়ে থাকে। তাই একজন মুজাহিদের উচিত সর্বদা শরীয়তের প্রতি লক্ষ্য রাখা। আর এটা তখনই সম্ভব, যখন তার নিকট ইলম থাকবে। এই ইলম এবং এর উপর আমলের বরকতেই মোল্লা মুহাম্মাদ উমর মুজাহিদকে বর্তমানের আমীরুল মুমিনীন বানিয়েছে। এবং উসামা বিন লাদেনকে উম্মতে মুসলিমার প্রত্যেক সাধারণ ও বিশেষ এবং মুজাহিদ ও গাইরে মুজাহিদের জন্য শাইখ উসামা বানিয়ে দিয়েছে। অতএব আজ প্রয়োজন হলো, যেখানেই মুজাহিদগণ থাকবে, তাঁরা ইলমের বাতিকে অর্জন করবে এবং আলোকিত রাখবে। যাতে যেখানেই অজ্ঞতার অন্ধকার এসে যায় তাঁরা তা আলোতে পরিণত করতে পারেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দ্বীনের মেহনত এবং দ্বীনকে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন, এ দ্বীনের হেফাজতকারী জামাআতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। যখন আপনি ইলম অর্জন করবেন এবং তার উপর আমল করবেন এবং এই আমলকে প্রসার করবেন, তখন এই দ্বীনের হেফাজতকারী দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন।

জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহতে দ্বিতীয় যে বিষয় আমি শিখেছি, তা হলো মানুষ যখন বিপদ এবং পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, তখন সে সময় ধৈর্য ধারণ করা কত জরুরী। মুজাহিদগণ প্রতিটি কদমে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়, যখন তাঁরা সেই পরীক্ষার উপর ধৈর্য ধারণ করেন, তখন তাঁরা আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। মানুষের জীবনের অবস্থা পরিবর্তন হতে থাকে। কখনো আনন্দের মুহূর্ত থাকে, কখনো পেরেশানির অবস্থা হয়। শয়তান সর্ব অবস্থায় বান্দাকে প্রলোভন দেওয়ার চেষ্টা করে। খুশির অবস্থায় গাফলতিতে ফেলে দেয়, আর যখন পেরেশানির অবস্থা থাকে, তখন নৈরাশ বানিয়ে দেয়। গাফলতিতে যে পড়েছে সেও পথ থেকে সড়ে যায়, আবার নৈরাশ যে হয়েছে, সেও পথ থেকে সড়ে যায়। মানুষ যখন খুশির অবস্থায় থাকে তখন শুকরিয়া আদায় করা উচিত। আর চিন্তা

পেরেশানিতে থাকে তখন ধৈর্যধারণ করা উচিত। আল্লাহ তাআলা ধৈর্য - ধারণকারীদের মোহাব্বত করেন।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (সূরা আনফাল ৮: ৪৬)

আল্লাহর মোহাব্বত তাদেরই নসীব হয়ে থাকে। যাদের সাথে পরওয়ারদিগার থাকেন, কে আছে তাদের চুল হেলাতে পারে? আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদের গুনাহ ক্ষমে করে দেন, এবং তাদেরকে অনেক বড় প্রতিদান দান করেন। যখন তার উপর কোন বিপদ-আপদ আসে, তখন সে এর উপর খুশি হয় যে, আল্লাহ তাআলা আমার উপর সন্তুষ্ট। কেননা হাদিস শরীফে এসেছে যে, আনন্দ প্রতিদিন আল্লাহ তাআলার সামনে হাত বেধে দাড়িয়ে থাকে এবং বলে হে আমাদের রব! আমাদের ব্যাপারে আপনার কি ফয়সালা? আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, অমুক অমুক জালেম এবং বিরোধীদের নিকট চলে যাও, আনন্দকে তাদের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপর ক্ষুধা, চিন্তা, পেরেশানি ইত্যাদি আল্লাহ তাআলার নিকট যায়, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, আচ্ছা তোমরা আমার প্রিয় বান্দাদের নিকট চলে যাও। হাদিস শরীফে আরও এসেছে, যে বান্দার, আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে মোহাব্বত আছে, তার উপর পেরেশানি এমনভাবে আসে, যেমনিভাবে পানির ঢল তার দিকে দ্রুত নেমে আসে। জিহাদে পেরেশানি এসেই থাকে, কিন্তু এটা সামান্য পেরেশানি। কারণ তারপরে সদাসর্বদার জিন্দিগিতে তার সাওয়াব এবং প্রতিদান পাবে। জিহাদের ময়দানে মুজাহিদদের বিভিন্ন পেরেশানি এসে থাকে, কখনো অস্ত্রের স্বল্পতার কারণে, কখনো জায়গা না পাওয়া যাওয়ার কারণে, কখনো সৈন্য সংখ্যা কম হওয়ার কারণে অথবা অন্য কোন পেরেশানি।

তারপর যখন তাঁরা ধৈর্যের পরাকাষ্ট প্রদর্শন করেন, আল্লাহ তাআলা এমন পথ খুলে দেন যা সম্পর্কে তাদের ধারণাও থাকেনা। মানুষের উপর অনেক পরীক্ষা এসে থাকে, যার দ্বারা মানুষের অন্তর সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু যখনই সে এই পরীক্ষা

সমূহে ধৈর্যধারণ করে, তখন মানুষ সেই সহজতা দেখে যা তার ধারণাতেও থাকেনা। এ ব্যাপারে আমার নিজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। কেননা এর সাক্ষ্য স্বয়ং কুরআন দিচ্ছে যে, নিশ্চয় কঠিনের পর–ই সহজ। আল্লাহ তাআলা সূরা আনফালে ইরশাদ করেন, যদি তোমাদের মাঝে বিশ জন দৃঢ়পদের অধিকারী হয়ে যায়, তাহলে তারা দুইশত কাফেরদের উপর বিজয় লাভ করতে পারবে। আর যদি একশতজন এমন থাকে, তাহলে এক হাজারের উপর বিজয় লাভ করতে পারবে।

শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ বলতেন, আমার বিশ জন আল্লাহর এমন বান্দা প্রয়োজন, যারা ধৈর্য ধারণকারী হবে এবং যাদের বীরত্ব পাহাড়ের সাথে পাল্লা দিতে পারে, তাহলে আমি পুরো কুফর বিশ্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে যাব। তাই যখনই কোন ব্যক্তির কোন মসিবত আসে, তখন সে মসিবত থেকে পলায়ন নয় বরং ধৈর্যধারণ করতে হবে।

সর্বশেষ বিষয় যা আমি জিহাদের ময়দানে শিখেছি তা হলো, প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলার উপর তাওয়াক্কুল এবং ভরসা রাখা চাই। এটি ইবাদাতের মধ্যে হতে একটি, সুতরাং এটি শুধু আল্লাহ তাআলার উপরই হওয়া চাই। যদি কখনো কোন ব্যক্তি অথবা কোন মুজাহিদের কঠিন অবস্থা সামনে আসে অথবা অন্য কোন মসিবত আসে, তখন তার উচিত আল্লাহ তাআলার উপরই ভরসা করা। কেননা অন্য কারো উপর ভরসা করা জায়েজ নেই। আল্লাহ পাক কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন, মুমিনের জন্য উচিত, সে যেন আল্লাহ তাআলার উপরই ভরসা করবে। হযরত সা'দ বিন জুবাইর রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করাই পুরো ঈমান। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে মুমিনদের গুণাবলী উল্লেখ করে বলেন,

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

অর্থ: এসকল লোক তথা ঈমানদারগণ আল্লাহ তাআলার উপরই ভরসা করে। (সূরা তাওবা ৯:৫১)

এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলার উপর তাওয়াক্কুল এবং ভরসা করা ঈমানের জন্য আবশ্যক। তাই প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তাআলার উপরই ভরসা করা উচিত। তিনি ব্যতীত সে কারো প্রতি আশা রাখবে না। আর না

তিনি ব্যতীত তার অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকা চাই। না তিনি ছাড়া সে কারো নিকট নিজ আশা কামনা করবে। না অন্য কারো সামনে সে মাথা নত করবে। কেননা আল্লাহ তাআলা পরিপূর্ণ কুদরতের অধিকারী। তিনি একক বাদশাহ, তাঁর কোন শরীক নেই। কেউ আল্লাহ তাআলার হুকুমকে বাধাগ্রস্ত করতে পারেনা। যখন আল্লাহ তাআলা মুমিনদের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, যেন তারা তাওয়ক্কুল এবং ভরসা শুধু আল্লাহ তাআলার উপর করে।

**তাহলে হে আমার বন্ধু এবং প্রিয় মুজাহিদ সাথীগণ!** তাহলে তারপরও আমরা কেন, কোন রাজা বা ব্যক্তির উপর ভরসা করব? তারপরও আমরা কেন বলি যে, যদি তিনি আমাদের সাহায্য করার জন্য না আসে তাহলে আমাদের কিছু হবেনা? সাহাবায়ে কেয়াম রাদিআল্লাহ আনহুম আজমাঈনের রবও তিনিই যিনি আমাদের রব। ঐ সকল মহান ব্যক্তিবর্গ আল্লাহ তাআলার উপর তাওয়াক্কুল এবং ভরসা করেছেন এবং স্বল্প সামর্থ্য নিয়ে পুরো বিশ্বকে আলোকিত করেছেন। এটাই হলো ঈমানের তাকাযা, আমরা সর্বদা আল্লাহ তাআলার উপর তাওয়াক্কুল করি এবং ভরসা তারই উপর রাখি। যদিও আমাদের নিকট যত কম সামর্থ্য থাকুক না কেন! অথবা যতই টেকনোলজি থাকুক না কেন! তারপরও আমরা আল্লাহ তায়ালার উপরই তাওয়াক্কুল এবং ভরসা করি।

আর তাওয়াক্কুল এবং ভরসার শিক্ষা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও পরিপূর্ণ গুরুত্বের সাথে দিয়েছেন। যখন হিজরতের সফর চলছিল, তখন তিনি সাওর পর্বতের গর্তে লুকিয়েছিলেন, যাতে কুরাইশদের পিছু নেওয়া থেকে বাঁচতে পারেন। আর তখন তাঁর সাথে সফরসঙ্গী হিসেবে হযরত সিদ্দীকে আকবর রাযিয়াল্লাহ আনহুও ছিলেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর অনুভব করলেন যে, কাফেররা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে চলতে-চলতে গর্তের কাছে চলে এসেছে। আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহ আনহু বললেন, আমি মুশরিকদের পা দেখতে পাচ্ছি, হে আল্লাহর রাসূল! যদি তাদের মধ্য হতে কোন একজন নিচের দিকে উঁকি মেরে তাকায়, তাহলে তো আমরা ধরা পরে যাব। তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদ্দীকে আকবরকে তাওয়াক্কুল এবং ভরসা শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে কথা বললেন, তা কুরাআনের শব্দে ব্যক্ত হয়েছে,

**لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا**

অর্থ: (আবু বকর!) তুমি চিন্তা করোনা নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমাদের সাথে আছেন। (সূরা তাওবা ৯:৪০)

সর্বশেষ সকল মুজাহিদগণের প্রতি আমার আবেদন, যদিও আপনাদের নিকট আসবাব অল্প হোক না কেন, তারপরও তাওয়াক্কুল এবং ভরসা আল্লাহর উপর রাখবেন। আসবাব থেকে দৃষ্টি সরিয়ে স্রষ্টার দিকে রাখবেন। আর এটাই হলে কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর তাকাযা। এই কালিমা আমাদের কাছে এটাই চায় যে, আল্লাহ ব্যতীত কারো থেকে কিছু হয়না। আর যা কিছু হয় তা আল্লাহ তাআলার হুকুমেই হয়।

# হিন্দু: নিকৃষ্ট শাসক ও উৎকৃষ্ট জনগণ

মুহাম্মাদ রাশেদ দেহলভি

**কৃষকদের উপর যুলুমের স্টীমরোলার:**

**হিন্দুস্তান:** যার অধিকাংশ অঞ্চল কৃষিজমি, যার চারণভূমি এতটাই উর্বর যে, যার দ্বারা সাধারণ মানুষ সম্পদের দিক থেকে কোন প্রকার পেরেশানিতে থাকার কথা নয়। কিন্তু এ দেশেই কৃষক শ্রেণী যে সমস্যায় জর্জরিত তা কারো নিকট অস্পষ্ট নয়। ১৯৪৭ ইংরেজি সাল থেকে আজ পর্যন্ত ভারতের কৃষকদের মাঝে আত্মহত্যাকারী কৃষকের সংখ্যা তিন লক্ষ (৩০০,০০০) হয়ে গেছে। এর কারণ হলো, ঋণ, সুদ, কৃষি সরঞ্জামের চড়া মূল্য ইত্যাদি। গত তিন মাসে পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং পশ্চিম উত্তর প্রদেশের কৃষক এবং প্রশাসনের মাঝে কৃষি সংক্রান্ত তিনটি আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন অব্যাহত ছিল। ভারতের কৃষকদের কথা হলো, এসকল আইন হালকা করার ফলে ফসলের ক্রয় - বিক্রয়ের বাজার নিঃশেষ করে দেয়া হয়। যার দ্বারা কৃষকদের অবস্থা অধিক থেকে অধিকতর খারাপ হয়ে যাবে, এবং তাদেরকে তাদের ফসলের সঠিক মূল্য আদায় করা হবেনা। কেননা সরকার যখন নিজের এই অবস্থানের উপর (যে, চাষাবাদে উন্নতি হবে এবং কৃষক নিজের ইচ্ছামত মূল্যে ফসল বিক্রি করতে পারবে।) বাধা দিল। তখন সরকার এবং কৃষকদের মাঝে আন্দোলন চলাকালে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ টপিকস হয়ে দাড়ায়। যখন ২৪ ই জানুয়ারি ২০২১ (যা ভারতের গণতন্ত্র দিবস ছিল) ভারতের কৃষকগণ কঠিন নিরাপত্তা উপেক্ষা করে দিল্লির লাল কেল্লায় প্রবেশ করে এবং নিজেদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পতাকা উত্তোলন করে। সেখানে কৃষকদের ট্রাক্টরের র‍্যালি এত বড় ছিল যে, মানুষ ভারতের ট্রেন কে ভুলে গিয়েছিল এবং পুরো দিন দিল্লিতে একটি হৈচৈ পড়ে গেল। এক দিকে ভারতীয় প্রশাসনিক বাহিনী নিজেদের শক্তির প্রদর্শন করতে থাকে, অপর দিকে কৃষকরাও পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে বসে থাকে। সরকার এবং তাদের পুলিশ বাহিনীর প্রতি কৃষকদের এতটাই ঘৃণা জন্মেছে যে, কিছু কৃষক নিজেদের ফসলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। যাতে এই ফসল কাটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে না পড়ে, ফলে সরকারের বিরুদ্ধে চলমান আন্দোলনে ভাটা পড়ে যায়।

ভারতীয় সরকার এবং কৃষকগণ কেউ পিছু হটতে প্রস্তুত ছিলোনা, এরই মধ্যে তাদের উভয়ের মাঝে কয়েকবার নিষ্ফল আলোচনাও হয়েছিল। মোদি সরকার

বরাবর অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোকে দোষারোপ করছিল এবং নিজেরা কঠোর অবস্থানের উপর দৃঢ় ছিল।

## কৃষকদের জন্য কোন বাজেট নেই:

সরকার ২০২১ ইংরেজী অর্থ বছরের বাজেটে কৃষকদের জন্য কোন বিশেষ অংশের ঘোষণা দেয়নি, কিন্তু প্রতিরক্ষা বাজেটে আঠারো (১৮) পার্সেন্ট বৃদ্ধি করেছে। রাজ্যের অর্থনৈতিক ধ্বস, গরীব সাধারণ মানুষের পেরেশানি, কৃষকদের উপর অত্যাচার সেই সাথে হিন্দুস্তানের সবচেয়ে বড় "বাচ্চামি" মুসলমানদের বিরুদ্ধে অব্যাহত জুলুম ও বাড়াবাড়ি (যার মধ্যে উত্তর প্রদেশে "লাভ জিহাদ[১]" এর বিরুদ্ধে আইন সচল রয়েছে।) রাষ্ট্রকে কুড়ে খাচ্ছে। "লাভ জিহাদ আইন" শিথিল হওয়ার পর এমন কিছু খবর ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পরে যে, প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম ছেলে এবং প্রাপ্তবয়স্ক হিন্দু মেয়ে যদি নিজেদের মাঝে বিবাহ করতে চায় এবং ধর্ম পরিবর্তন করতে চায়, হিন্দুস্তানী আইন পরিষ্কারভাবে যার অনুমতি দিয়ে থাকে। কিন্তু আরে ভাই! তোমার জন্য এই কানুন, এই আইন এক রকম আর আমার জন্য এ দেশের কানুন এবং আইন অন্য রকম...। মুসলমানদের জন্য নিজেদের ধর্মের প্রচার করা অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। কোন হিন্দু মেয়েকে বিবাহ করা এবং তার ধর্ম পরিবর্তন করার অপরাধে দশ হাজার রুপি জরিমানা এবং এক বছর জেলে শাস্তি ভোগ করতে হবে। সকলের সাথে, সকলের উন্নয়নয়ের স্লোগান দেওয়া মানুষের আকৃতিতে এমন হিংস্র জানোয়ার হয়ে আছে যাদের হত্যা করা মুসলমানদের সাথে এ দেশের সাধারণ জনগণেরও দুনিয়া আখিরাতের জন্য কল্যাণকর।

## হিন্দুস্তানের মাটি ও মানুষ:

হিন্দুস্তান এমন একটি দেশ যেখানকার মানুষ অত্যন্ত পরিশ্রমী, যেখানকার জমিন খুবই উর্বর, যে দেশ পুরো পৃথিবীতে নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দেখিয়েছে, কিন্তু

[১] এটি উগ্র ও রক্ষণশীল হিন্দু সংগঠনগুলির ব্যবহৃত একটি পরিভাষা যার অর্থ হলো মুসলিম ছেলে কোন হিন্দু মেয়েকে ভালোবেসে বা বিয়ে করে জোরপূর্বক অথবা ধোকা দিয়ে ঐ মেয়ের ধর্মকে পরিবর্তন করা।

কখন? যখন এ দেশে প্রতিষ্ঠা ছিল আল্লাহ তায়া'লার আইন বা শরিয়াহ। জালেমকে বাধা প্রধান করা হতো এবং মাজলুমদের সাহায্য করা হতো। কিন্তু যখনই এখানে ভ্রান্ত নীতি এবং জালেম শাসক ক্ষমতায় আসল তখন থেকে দেশে জুলুম ও বাড়াবাড়ি বৃদ্ধি পেতে লাগল।

মানুষের তৈরি আইন কখনো স্থায়ী হতে পারেনা, আর যদি সে মানুষটি এমন হয় যে, গোত্র প্রেমে অন্ধ এবং নিজেদের আপন ধর্মে উঁচু নিচুর ভিত্তিকে ভাঙ্গতে পারেনা, তাহলে এসকল গোত্র প্রেমী লোকজন সাধারণ জনগণ (বিশেষ করে অন্য ধর্মের অনুসারীদের) সাথে কিভাবে ইনসাফ করবে? এসকল লোক সর্বদা নিজেদের গদিকে বাঁচানোর চিন্তায় বিভোর থাকে। নিজেদের স্বার্থ নিয়েই চিন্তা করবে। কিন্তু উপমহাদেশের ভূমি এমন একটি সংবিধান প্রত্যক্ষ করেছে, যা কোন মানুষ নিজের সত্তাগত শক্তি দ্বারা তৈরি করেনি, আর না কোন রাজনৈতিক দল। সে সংবিধানে সকলের প্রতি খেয়াল রাখা হতো, চাই সে গরিব হোক অথবা ধনী, চাই মুসলিম হোক অথবা অন্য কোন ধর্মের অনুসারী। আর তা হলো 'আল্লাহর সংবিধান' যা এ অঞ্চলের সকল কিছুর উপর বিজয়ী ছিল, যা সাধারণ মানুষের মন জয় করে নিয়েছিল। শিরকের মাঝে ডুবন্ত হিন্দুস্তানি জনগণ এর পূর্বে কখনো নিরাপত্তার মুখ দেখেনি। কেননা যখন মানুষদের মধ্য হতেই কিছু মানুষ দেবতা হয়ে যায়, তখন এই 'খোদা' নিজ 'মাখলুক' এর প্রতি এমন ধারণা রাখে যে, সে-ই নিরাপত্তাদাতা এবং হেফাজতকারী! সাধারণ মানুষ শাসকদের ভয় করবে এবং শাসকগণ আত্মপুজারী হবে। এ বিষয়ে একটি উদাহরণও রয়েছে।

**স্বতীদাহ বা আত্মাহুতির প্রথা:**

'স্বতীদাহ বা আত্মাহুতির প্রথা' হিন্দু সমাজে সর্বোচ্চ ভয়াবহ প্রথা ছিল, যে প্রথা অনুযায়ী স্বামীর মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে তার স্বামীর চিতায় জীবন্ত জ্বালিয়ে দেয়া হত। হিন্দুস্তানে ইসলাম আগমনের পর মুসলিম শাসকগণ অত্যন্ত কৌশলে এই ভয়াবহ প্রথাকে শেষ করে দেন। তার বাধ্যবাধকতা জুড়ে দেয়া হয় যে, কোন হিন্দু নারী বিচারকের নিকট জিজ্ঞাসা করা ব্যতীত আত্মাহুতি দিতে পারবেনা। ফলে যখন আত্মাহুতি দিতে চাওয়া নারী বিচারকের নিকট আসত, তখন সেই বিচারক তাকে বোঝাতেন যে, (মহিয়সী! তুমি কেন নিজের জীবনকে নিজ হাতে শেষ করে দিতে

চাচ্ছ?) যদি বিচারকের বুঝানোর পরও সে নারী আত্মাহুতি দিতে রাজি থাকত, তখন সেই বিচারকগণ তাদেরকে নিজ স্ত্রীদের নিকট পাঠিয়ে দিতেন, যাতে তারা বুঝাতে পারেন।

যার ফলে সে এলাকায় যেখানেই মুসলিম বিচারক ছিলেন, সেখানে আত্মাহুতি দিতে চাওয়া নারীদের সংখ্যা কমে গেল। হিন্দুস্তানে ইসলাম আগমনের পর লাখ লাখ মানুষ ইসলামকে অন্তরে স্থান দিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে সময় আবার উল্টো দিকে ঘুরে গেছে এবং সে সকল জালেম ও অত্যাচারী শাসকগণ সাধারণ জনগণের ঘাড়ে চেপে বসেছে। আর এই আধুনিক যুগে তারা স্বতীদাহ প্রথার পরিবর্তে 'নিউগ'(হিন্দুদের একটি পরিভাষা) এর রুসুম চালু করেছে। যে রীতি অনুযায়ী হিন্দু বিধবা নারীরা দ্বিতীয়বার বিবাহ তো করতে পারবেনা, তবে অন্য কোন পুরুষের সাথে শারীরিক সম্পর্ক করতে পারবে এবং এভাবে দশজন অবৈধ সন্তান জন্ম দেয়ার অনুমতি রয়েছে। যদি কোন হিন্দু নারীর স্বামী কোন কাজের জন্য, পড়ার জন্য অথবা ধর্মীয় কোন কাজে যদি কোথাও এক দিনের জন্যও যায়, তাহলে তার স্ত্রীর অনুমতি রয়েছে যে, সে অন্য কোন পুরুষের সাথে শারীরিক সম্পর্ক করতে পারবে।

এই হলো হিন্দু ধর্মের ঠিকাদারদের অবস্থা, যারা সাধারণ জনগণকে নোংরামিতে ডুবিয়ে এবং তাদের পিছনে এমন সব ধরণের শক্তি দাড় করিয়ে রেখেছে যে শক্তি দেশের নিরাপত্তার জন্য হয়ে থাকে।

মোটকথা: মানুষের সৃষ্টিকর্তাই ভালো জানেন যে, মানুষদের মধ্যেকার সমস্যার সমাধান কিভাবে করা যাবে। হিন্দুস্তানে আটশত বছর থেকে বেশি সময় মুসলমানদের শাসন ছিল, তখন মুসলমানরা সর্বক্ষেত্রে উন্নতি করেছিল। এই দেশকে আল্লাহর হুকুমে শরিয়াহর ন্যায় একটি পবিত্র সংবিধান দিয়েছিল, যার ফলে শিরকে ডুবন্ত সাধারণ মানুষের আবর্জনা পরিষ্কার হয়েছিল।

**ইসলামী শাসনের কয়েকটি উদাহরণ:**

মুসলিমদের ইসলামী শাসনের কয়েকটি উদাহরণ এখানে লিখে দেওয়া হলো। যার দ্বারা উদ্দেশ্য নিজেদের পরাজিত উম্মাহকে এই বার্তা দেওয়া, যে কিভাবে মুসলমানগণ এই দেশে থেকে দুনিয়াকে নেতৃত্ব দিয়েছে।

- বর্তমান সময়ে প্রত্যেক দেশ স্বীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা এবং তাকে উন্নত করার মাঝে ডুবে আছে। কিন্তু এমন একটি সময় ছিল যখন আপনাদের পূর্বপুরুষরাই দেশের মুসলিম শাসকগণ ১৭০০ ঈসায়ী সনে হিন্দুস্তানের জি.ডি.পি. কে চব্বিশ (২৪) পার্সেন্ট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন। যা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী অর্থনীতি ছিল, সে সময় এই শক্তিশালী অর্থনীতির সামনে চীন এবং ইউরোপও পাল্লা দিতে পারতোনা, তারাও আপনাদের পিছনে ছিল।
- আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, যে আঠার শতাব্দী পর্যন্ত পৃথিবীর শিল্পের পঁচিশ (২৫) পার্সেন্ট সম্পদ হিন্দুস্তানে তৈরি করা হতো।
- পুরো বিশ্বে কাপড়, সুতা এবং রেশম ইত্যাদি আমদানিকারী হিসেবে সবচেয়ে বড় দেশ ছিল হিন্দুস্তান। যেখানে আবার লিস্টের সবার উপরে ছিল 'বাঙ্গালা'। যার বিনিময় হিসেবে হিন্দুস্তানকে দেওয়ার মত পুরো বিশ্বের নিকট স্বর্ণ, রুপা ব্যতীত অন্য কিছু ছিলো না।
- বর্তমানে আমাদের দেশে মুসলমানরা অর্থের অভাবে সীমাহীন পেরেশানিতে রয়েছে। কিন্তু সামান্য চিন্তা করুন কেন আঠারো শতাব্দীতে বাঙ্গালা ও দক্ষিণ ভারতের লোকজনের আয় আর জীবনযাত্রার মান যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপীয়দের থেকে অনেক উন্নত ছিল।
- ফ্যাশনের জন্য যুক্তরাজ্যের বাসিন্দারা পঁচানব্বই (৯৫) পার্সেন্ট কাপড়, রেশম এবং সুতা হিন্দুস্তান থেকে সংগ্রহ করতো। কৃষি এবং শিল্প খাতগুলোতে মোগল ইন্ডিয়া এতটাই অগ্রগামী হয়েছিল যে, সকল জিনিসের মূল্যহ্রাস পেয়ে গিয়েছিল। যার ফলে মানুষের জন্য জীবিকা নির্বাহ করা একেবারে সহজ হয়ে গিয়েছিল। (অথচ আজ ভারতে স্কুলে পড়ুয়া কোন বাচ্চাই জানেনা যে 'মোগল' কি জিনিস।) দু'বেলার রুটি তাদের জন্য কোন বিষয়-ই ছিলনা। ইতিহাসবিদগণ লেখেন যে, মানুষ এতটাই ভালো অবস্থায় ছিল যে, সাদাকা এবং যাকাত নেওয়ার মত কোন লোক পাওয়া যেতনা।

তখন এদেশে শরিয়াহ বাস্তবায়ন ছিল, মুসলিম শাসক ছিল এবং মুসলমানগণ স্বাধীন ছিলেন। তাদের তাহযীব – তামাদ্দুন ছিল উন্নত। এটা অসম্ভব ছিল যে,

ধর্মীয় নেতৃত্ব অথবা প্রসিদ্ধির উপর ভর করে কেউ জুলুম বা অন্যায় করবে। দেশের সকল সেকশনে ছিল উন্নতি। এর কারণ ছিল দেশের উপর কর্তৃত্বকারীগণের অন্তরে আল্লাহর ভয় ছিল। তারা নিজেদেরকে সাধারণ জনগণের সেবক মনে করতেন এবং তাদের জন্য পদবি একটি বোঝা ছিল, না কোন ধোঁকা এবং অহংকারের বস্তু ছিল!

ইসলামি চিন্তাবিদ মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহিমাহুল্লাহর কিছু উক্তি (কিছুটা শাব্দিক পরিবর্তনের সহিত) এমন,

> "আজ দেশ আত্মহত্যা করার শপথ নিয়েছে, আগুনের গর্তে ঝাপ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। চরিত্রহীনতায় মানবতা আজ ধ্বংসের মাঝে ডুবে আছে। এখনও যে সকল ঈমানদারগণ আছে, তারা শুধু হিন্দুস্তান নয় বরং পুরো এশিয়াকে বাঁচাতে পারে। আপনি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বলুন! আপনার কোন প্রয়োজন নেই যে, আপনি নিলামের মণ্ডপে উঠে আসবেন এবং আপনি আপনার নিজের মূল্য হাঁকাতে থাকবেন, যাতে আমাদের কথা লেগে যাবে। আপনি তো অমূল্য সম্পদ, যার ক্রেতা আল্লাহ ব্যতীত কেউ ক্রয় করতে পারবে না। তাই আমি চিৎকার করে বলতে পারি, হায় যদি আপনার অন্তর এবং বিবেকের উপর প্রভাব ফেলতে পারতাম। আমি শুধু আপনাকেই বলছি এই দেশকে কেবল মাত্র আপনিই বাঁচাতে পারেন। এ জন্য যে, আপনার নিকট রয়েছে একত্ববাদের আক্বীদা, মানবতার নীতিমালা এবং সাম্য। আপনার নিকটই রয়েছে সামগ্রিক ইনসাফের পরিপূর্ণ সংবিধান। আপনিই সে জিনিস, যা সকল জিনিস থেকে উৎকৃষ্ট। আপনিই তো সে ব্যক্তি যার নিকট রয়েছে পরকালের বিশ্বাস এবং যে (উত্তম পরিণতি মুত্তাকীদের জন্য) এর উপর বিশ্বাস রাখে। আপনি সে সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত নন, যাদের দৃষ্টি বাহ্যিক শক্তি-সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল। আর না আপনাকে সে সকল লোকদের মাঝে গণ্য করা হয়, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং পার্লামেন্টের সদস্য হওয়াকে সবচেয়ে বড় মে'রাজ (মর্যাদা) মনে করে।

**“ইসলাম” বিশ্বের সবচে বড় নেয়ামত:**

দ্বীন ইসলাম পুরো বিশ্বের জন্য সবচেয়ে বড় নেয়ামত, কারণ মানুষ নিজের ফায়দার জন্য কি পরিমাণ নিচে নামতে পারে। এবং নিজের বাদশাহীর জন্য লক্ষ নয় বরং কোটি কোটি মানুষকে নোংরামির কাঁদায় ফেলে দিয়ে নিজের গোলামে পরিণত করতে পারে।

আল্লাহ তা’আলার লাখ লাখ অনুগ্রহ ও অনুকম্পা যে, তিনি আমাদেরকে নিজের দ্বীন দান করেছেন। তাই এ দ্বীনের দাওয়াহ দেওয়া এবং তা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা আমাদের জন্য আবশ্যক। কেননা আল্লাহ তায়ালা এ দায়িত্ব আমাদের কাঁধে দিয়েছেন। প্রত্যেক ভ্রান্ত বিধানের বিরুদ্ধে এবং দ্বীনের পথে প্রত্যেক প্রতিবন্ধকতাকে উৎখাত করা একমাত্র জিহাদের মাধ্যমেই সম্ভব। একথা আমরা যত তাড়াতাড়ি বুঝব ততোই আমাদের এবং আমাদের দ্বীনের জন্য কল্যাণ হবে। কেননা, কাফেরদের সৈন্যরা আমাদেরকে ঘিরে রেখেছে। সত্য দ্বীনের দাওয়াহ তখনই বেশি প্রভাব ফেলবে যখন আমাদের হাতে সামর্থ্য থাকবে। যখন দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদের কারো নিকট মিনতি এবং করজোড় নিবেদন করতে হবেনা। যখন আমরা দ্বীনের মাঝে অনুপ্রবেশকারীদেরকে প্রতিরোধ করতে পারব।

**ধর্ম গ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত!**

আজকে হিন্দুস্তানের অবস্থা হলো, কোন হিন্দু স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করতে পারেনা। তাদের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে, তাদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে, ধমকি দেওয়া হচ্ছে। আর মুসলমানদের অবস্থা তো হলো, তারা এটা বলতেও অক্ষম যে, ভাই আমাদেরকে প্রাণে মেরো না! তোমরা যা বলবে আমরা তাই করব!!!

**সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ:**

আজ হিন্দুস্তানে জালেমদের ভীত অত্যন্ত মজবুত, যারা কয়েক বছর প্রস্তুতির পর মাথা উঠিয়েছে আর এখন নিজ রাজ্য এবং মাথা উঁচু করতে চায়। তাদের কব্জায় ক্ষমতা রয়েছে এবং তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য আর তাদের জুলুম থেকে

মুক্তির জন্য আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের উপর জিহাদ ফরজ করেছেন। একথা আমরা যত তাড়াতাড়ি বুঝব ততোই আমাদের জন্য এবং এ অঞ্চলে বসবাসকারী জনগণের জন্য কল্যাণ হবে। যাতে এ অঞ্চলে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়, হকদার যেন নিজের হক পেয়ে যায়। মানুষের মাঝে যেন জাতের নামে ভেদাভেদ না থাকে।

আল্লাহ তা'য়ালার নিকট দু'আ করি যেন তিনি আমাদেরকে এ দেশে ইসলামের বৃষ্টি বর্ষণ করার তাওফিক দেন (আমীন)। যাতে এ দেশের প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তি, ধনী হোক বা গরীব, সাধারণ হোক বা বিশেষ সকলেই যেন নিশ্চিন্ত ও নিরাপত্তার সাথে বুক ভরে প্রশান্তির শ্বাস নিতে পারে এবং নিজ মালিকের হক আদায় করতে পারে।

যেখানেই সভা-সমাবেশ সেখানেই জেগে উঠো

হোক না তা পূর্ব-পশ্চিম বা যেখানেই!!!

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ○

**‘নিশ্চই আল্লাহর কাছে সেই সর্বাধিক মর্যাদাবান যে সর্বাধিক পরহেজগার। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।’**
**(সূরা আল-হুজরা, আয়াত:১৩)**

## হাসনাইন হারিস

আনসারদের বসতি ‘ওয়াজিরিস্তানে’ শাইখ মোস্তফা আবুল ইয়াযিদ (রহিমাহুল্লাহ) ও উসমান আল-কিনী (রহিমাহুল্লাহ) এবং সাথে অন্য এক মুহাজির ভাইকে নিয়ে সফরে ছিলেন। তাঁরা তিনজন, শাইখ আব্দুর রহমান কেনেডী (রহিমাহুল্লাহ) এর বাড়িতে যাচ্ছিলেন। যোহরের নিকটবর্তী সময়ে তাঁরা গন্তব্যে পৌঁছালেন, তখন শাইখ কেনেডী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং তাঁর বাড়ির সাথে সংযুক্ত একটি কামরায় তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করলেন।

শাইখ কেনেডী (রহিমাহুল্লাহ) এর সাথে শাইখ মোস্তফা (রহিমাহুল্লাহ) এর কিছু বিষয়ে পরামর্শ করার ছিল, তখন উভয় গুরুজন পরস্পরে পরামর্শ করলেন। এরপর মেহমানদের জন্য দস্তরখানায় খাবার বিছিয়ে দেওয়া হলো। খাওয়ার মাঝে কথাবার্তার পর্যায় পারিবারিক ও গার্হস্থ্য বিষয়ে পরিণত হলো। শাইখ মোস্তফা (রহিমাহুল্লাহ) উসমান আল-কিনী (রহিমাহুল্লাহ) এর হাঁটুতে হাত মারলেন এবং মজার ছলে অভিনব পন্থায় বললেন যে, ‘তার এ বিষয়ে কী আর ধারণা আছে? তার তো বিবাহ হয় নি!’

এই কথা শুনে শাইখ কেনেডী (রহিমাহুল্লাহ) আশ্চর্য ও বিস্ময় প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করলেন, ‘বিবাহ হয় নি? কী কারণে?’

(উসমান আল-কিনী (রহিমাহুল্লাহ) আফ্রিকান বংশোদ্ভূত ছিলেন এবং নিজের স্বজাতির মতো তিনি কালো রঙের (নিগ্রো), ভারী ছাপ ও লম্বা কাঁধবিশিষ্ট ছিলেন)

শাইখ মোস্তফা (রহিমাহুল্লাহ) বললেন, তার আকার-আকৃতি ও চেহারার কারণে এখানে সম্পর্ক গড়ে উঠছে না।

এমনটাই শোনার ছিল, শাইখ কেনেডী তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন যে, ‘লোকেরা তার বাহ্যিক চেহারাটাই দেখে, আর অন্তরটাকে উপেক্ষা করে থাকে।’

একথা বলে শাইখ কেনেডী নিজের কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ পেশ করলেন এবং মেহমানদের অনুমতি নিয়ে ঘরের ভেতরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি তাঁর

মেয়েকে সাথে করে নিয়ে ফিরে আসলেন। (যেই সকল মুজাহিদদের আহলিয়ারা ওনার মেয়েকে দেখেছিল, তাদের বর্ণনা মতে, ঐ মেয়েকে আল্লাহ তাআলা অতুলনীয় সৌন্দর্য এবং উত্তম চরিত্র দান করেছিলেন)

শাইখ কেনেডী (রহিমাহুল্লাহ) বলতে লাগলেন, 'এই হলো আমার কন্যা, একে আমি উসমানের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করছি।'

এই কথা বলে সেদিন মাগরিবের পূর্বেই সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিবাহের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এবং মেয়েকে উসমান আল-কিনীর সঙ্গে পাঠিয়ে দেন। এভাবেই কেবল তিনজনের সংঘবদ্ধ এই "বিবাহ কাফেলা" দুলহানকে নিয়ে প্রস্থান করে।

এরা ঐ সকল সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ লোক, যারা ইসলাম এবং দ্বীনকেই নিজেদের সবকিছু বানিয়ে নিয়েছিলেন। এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লামের দেয়া মানদণ্ডকেই বাস্তবিক অর্থে আবশ্যিক ও মৌলিক মানদণ্ড মেনে ছিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মদিনার আনসারদের এক সম্ভ্রান্ত বংশের নারী সাহাবিয়াকে সাইয়্যেদুনা জুলাইবিব (রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু) (যিনি দুনিয়াবি অবস্থান ও মর্যাদায় ঐ নারী সাহাবিয়া থেকে অনেক নিম্নমানের ছিলেন) এর সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন।

এগুলো চৌদ্দ শতাব্দীর পুরনো গল্প-কাহিনী নয়, বরং এগুলো হলো তাদের গল্প, যারা বর্তমান সময়ে নিজেদের সবকিছু দ্বীনের স্বার্থে দান করেছেন এবং যুদ্ধ করার জন্য হিজরত ও জিহাদের পথ অবলম্বন করেছেন। যারা নিজেদের সকল প্রকারের প্রিয় বস্তুকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পছন্দনীয় রাস্তায় উৎসর্গ করায় এবং আল্লাহ তাআ'লার সন্তুষ্টি লাভের প্রতিযোগিতায় লেগে আছেন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

## ◈ আল্লাহ তাআ'লার প্রতি সু-ধারণা এবং দুআ ◈

“তাওহীদের অনুসারীদের সর্বদা এই স্বভাব ছিল যে, যখনই তাঁরা কোনো বিপদ-পরীক্ষার সম্মুখীন হতো, তখন দুইটি কাজ করতো, ঐ পরীক্ষা, বিপদ-আপদ যতই কঠিন হোক না কেন!

প্রথম কাজ ছিল,‘আল্লাহ তাআ'লার প্রতি সু-ধারণা’, এবং দ্বিতীয় কাজ ছিল, ‘দুআ করা।’

বিপদের সময় এই দুটি ছাড়া আপনার নিকট আর কিছুই থাকবে না যখন আপনি সমস্ত উপাদান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। আপনার কাছে কেবল এই দুইটি বিষয়ই থাকে। এবং এই দুটি কাজের বদৌলতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কারামাত (অলৌকিকতা) নেমে আসে।

দুটি বিষয় স্মরণ রাখবেন: এক. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার প্রতি নেক ধারণা। দুই. দুআ করা।

**- শহীদ শাইখ আবু সুফিয়ান সাঈদ আল-শিহরী আল-আযদী (রহিমাহুল্লাহ)**